বুনিয়াদী শিক্ষার কথা

শ্রীঅনিলমোহন গুপ্ত, এম্. এ.

ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ বলরামপুর বুনিয়াদী শিক্ষণ শিক্ষা কেন্দ্র,
অধ্যক্ষ বুনিয়াদী শিক্ষণ শিক্ষা বিভাগ,
বিনয়-ভবন, বিশ্বভারতী

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা—১২

যিনি আমার একক যাত্রাপথ আশীর্ব্বাদে অভিষিক্ত করেছিলেন, যাঁর সস্নেহ উৎসাহ আমাকে নূতন পরীক্ষায় ব্রতী হতে সাহসী করেছে, আজ এই দীন প্রণাম যাঁর পায়ে পৌঁছে দেবার সামর্থ্য আমার নেই—

সেই চিরারাধ্য দাদামশাই

৺অনাথগোপাল সেনের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে।

ভূমিকা

'বুনিয়াদী শিক্ষার কথা'-য় গান্ধীজীর 'নঈ তালিম'-এর পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই পরিচয়ের প্রয়োজন আজ সর্ব্বাধিক।

পরাধীন ভারতে প্রধানতঃ পরের প্রয়োজনে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল, আজ স্বাধীন দেশে নিজের প্রয়োজন বলিয়া সে ব্যবস্থা চলিতে পারে না। সেই শিক্ষায় আমাদের লাভ কিছু হয় নাই এমন নহে, কিন্তু লোকসান হইয়াছে অনেক—তাহাতে ঘরের মানুষ পর হইবার পথে গিয়াছে।

স্বাধীন দেশে এখন আবার ঘরে ফিরিবার কাল আসিয়াছে। বাহিরে আমাদের এই ঘর প্রধানতঃ ভারতের সাতকোটি গ্রামে অনাদরে পড়িয়া আছে, আর অন্তরে তাহা রহিয়াছে আমাদের সুচির-সঞ্চিত বিচিত্র সংস্কৃতির মধ্যে।

পরের উচ্ছিষ্টরূপে নহে, শিক্ষা আজ আসুক দেবতার প্রসাদরূপে। সেই প্রসাদ সর্ব্বজনের কল্যাণের জন্য বিতরিত হউক। কিন্তু বহু সাধনায় বাণীর সেই প্রসাদ লাভ করিতে হয়। নঈ তালিম সেই বাণী-সাধনা—শিক্ষাকে নবরূপ প্রদানের প্রগল্‌ভ চেষ্টা। এই নবশিক্ষা নূতন ভারত গঠন করিবে।

ভারতীয় মনীষা স্বাদেশিকতার উপর এই নূতন ভারত গঠন করিতে চায়। এই স্বাদেশিকতা সঙ্কীর্ণ নহে—প্রসারিত হইয়া ইহা সহজে সর্ব্বত্র বিশ্বমানবকে স্পর্শ করিতে পারে। নঈ তালিম-পরিকল্পনার পশ্চাতে এই ভরসা আছে।

শিক্ষাকে আজ সর্ব্বত্র আমাদের জীবনের সহিত যুক্ত করিতে হইবে। সে যোগ একদিকে যেরূপ বিজ্ঞানসম্মত অপর দিকে সেইরূপ দেশের সংস্কৃতি-সম্মত হওয়া-চাই।

দেশের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় বহু বিষয়ের বিবিধ কথা মুখস্থ করিয়া মন-বোঝাই করিবার পথ খোলা আছে, কিন্তু কোন্ পথে শিক্ষার্থীর মন শিক্ষণীয় বিষয়ের স্পর্শে

সহজ আনন্দে স্বচ্ছন্দে সাড়া দিবে ও ধীরে ধীরে সৃজনক্ষম হইয়া উঠিবে তাহার সন্ধান করা হয় নাই। নঈ তালিম সেই সন্ধান করে।

শিশুমন আপন স্বাভাবিক গতিতে আপন হাতে কোন কিছু করিতে চায়। নঈ তালিম এই স্বাভাবিক গতি ধরিয়া তাহাকে স্পর্শ করে এবং স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে নানা বিষয়ে আকর্ষণ করে। এইরূপে শিশুর মন নিজের ভাবে থাকিয়া ক্রমশঃ সমৃদ্ধ ও বিকশিত হইয়া উঠে।

এইজন্য নঈ তালিমে হাতের কাজের মধ্য দিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়া স্বীকৃত।

আর কাজের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত বলিয়া এই শিক্ষা জীবনের সহিত সহজে যুক্ত হইতে পারে। জীবনে নানা কাজ। নঈ তালিম সর্ব্বজনের বলিয়া গ্রামে গ্রামে সর্ব্বজনের জীবনের মধ্যে ইহার ক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া আছে। গ্রামে গ্রামে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্যবিধান প্রভৃতি হাতের কাজ নবশিক্ষার বাহন হইলে শিক্ষা ত জীবনের সঙ্গে যুক্ত হইবেই। জীবনের সহিত যুক্ত হইবার পথে শিক্ষা হইবে সজীব, সক্রিয়, সৃষ্টিক্ষম, আনন্দপূর্ণ।

দেশের কৃষিশিল্পাদির উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা যদি সমবায়ের আশ্রয়ে বিকেন্দ্র ও শোষণমুক্ত হয়, তবে শোষণের বংশজাত মিথ্যা-প্রবঞ্চনাদি মাথা তুলিতে পায় না এবং সামাজিক সম্পর্কে সত্য ও প্রেম বিস্তার লাভ করিতে পায়। এইরূপ সমাজ-ব্যবস্থায় নঈ তালিম নিয়ত প্রাণরস যোগাইয়া দিবে আশা করা যায়।

ভারতীয় সংস্কৃতি দেশের সর্ব্বজনের মানসিক পরিমণ্ডলে ব্যাপ্ত, মনীষীগণের মনে তাহা ঘনীভূত। নঈ তালিমের সুস্থ সহজ পরিবেশ সেই সংস্কৃতিকে পুষ্ট করিয়া তুলিবার সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়।

নঈ তালিম সম্বন্ধে গান্ধীজী সম্প্রতি দিল্লীতে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল:

"নঈ তালিমের বয়স মাত্র ৮ বৎসর। একটি নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে

নূতন ভিত্তিতে একটা জাতির শিক্ষাব্যাপার সম্পর্কে এই অভিজ্ঞতা দীর্ঘ নয়। নঈ তালিমকে হাতের কাজের মধ্য দিয়া শিক্ষা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বর্ণনা ঠিক, আর লোকে ইহা বুঝিবে। তবে নঈ তালিম সম্পর্কে ইহা সত্যের একটা দিক মাত্র। এই নবশিক্ষার মূল গিয়াছে আরও গভীরে, মানুষের সর্ব্ববিধ কার্য্যে সত্য ও প্রেমের প্রয়োগের মধ্যে—সে কার্য্য ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত যে জীবনেরই হউক না কেন। জীবনের সকল কার্য্যে সত্য ও প্রেম অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে এই ধ্যান হইতেই হস্তশিল্পের মধ্য দিয়া এই শিক্ষার ধারণার উদ্ভব হইয়াছে। প্রেম চায় শিক্ষা সকলেরই সহজলভ্য হউক, আর গ্রামের প্রত্যেক লোকের প্রতিদিনের জীবনে তাহা কাজে লাগুক। এই শিক্ষা পুঁথি হইতে আসে না এবং পুঁথির উপর নির্ভর করে না। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সহিতও ইহার কোন সম্পর্ক নাই। এই শিক্ষাকে যদি ধর্ম্মানুগত বলা যায়, তবে সে ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন—খণ্ড ধর্ম্মসমূহ তাহা হইতেই আসিয়াছে। অতএব জীবনপুঁথি হইতেই এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।"

শিক্ষাসম্বন্ধে এই চিন্তা বৈপ্লবিক। কিন্তু মন অভ্যস্ত পথ ছাড়িয়া নূতন পথ ধরিতে চায় না। তাই নঈ তালিম সম্বন্ধে দেশের মন যেন উদাসীন ও সংশয়াচ্ছন্ন। কিন্তু স্বাধীন দেশের শিক্ষাকে স্বাধীনতা ও আত্মবিশ্বাসের উপযোগী করিয়া ত লইতেই হইবে।

'বুনিয়াদী শিক্ষার কথা'-য় এই নূতন শিক্ষাকে বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। লেখক নিজে শিক্ষাব্রতী—অনন্যকর্ম্মা হইয়া এই নূতন পথে যাত্রা করিয়াছেন। নঈ তালিমে তিনি একান্ত বিশ্বাসী, এই পথে অভিজ্ঞতাও অর্জ্জন করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার কথা শিক্ষাসম্পর্কে নূতন চিন্তা জাগাইবে এরূপ আশা করা সঙ্গত।

রতনমণি চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা

৪-২-৪৮
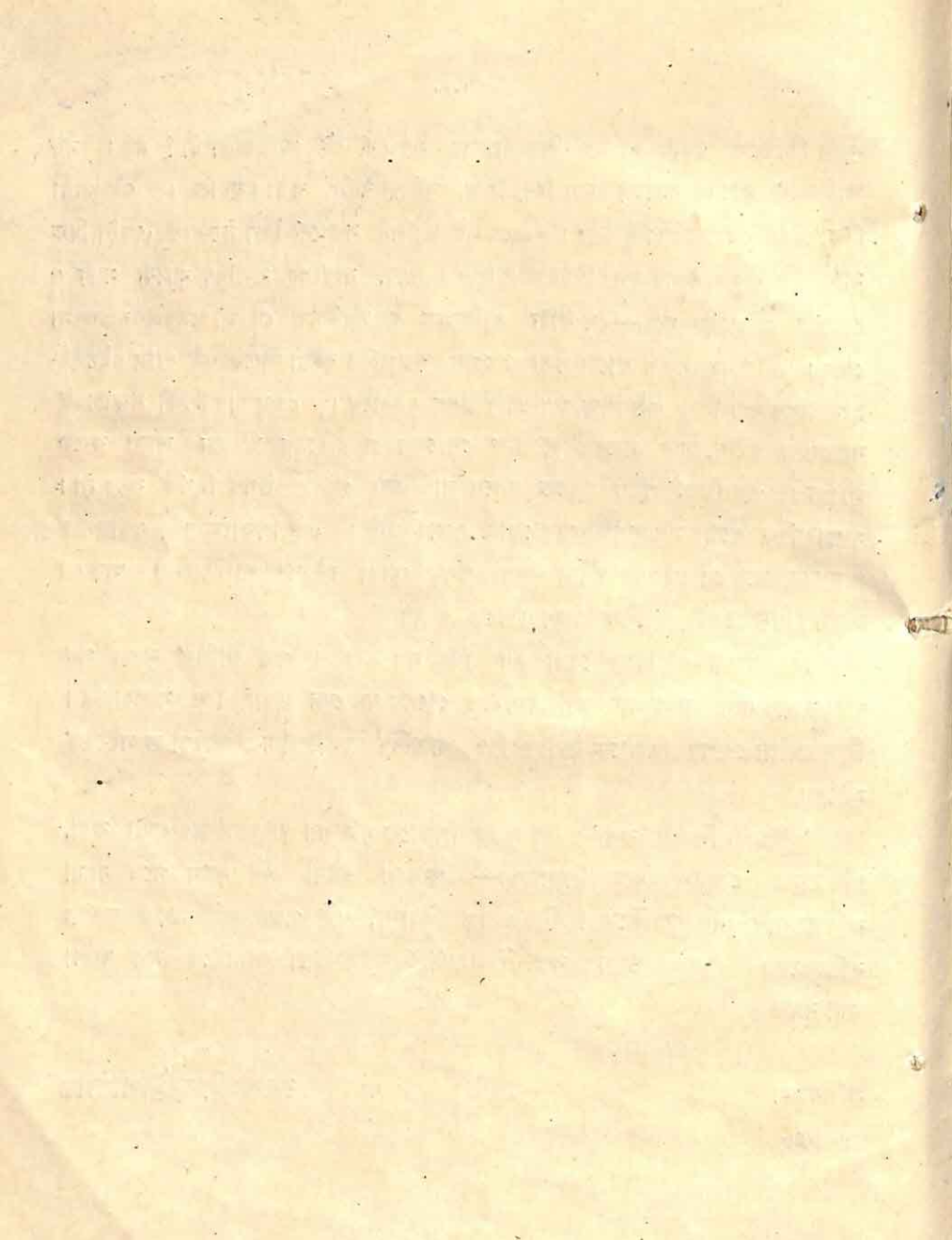
নিবেদন

এই পুস্তিকাটিতে 'বুনিয়াদী শিক্ষার কথা', 'আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ও নূতন পরিকল্পনা' এবং 'সেবাগ্রাম' এই তিনটি প্রবন্ধকে স্থান দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে শেষ দুইটি প্রবন্ধ ইতিপূর্ব্বে যথাক্রমে 'শনিবারের চিঠি' ও 'চুণ্টাপ্রকাশ'-এ প্রকাশিত হয়েছে। পুস্তিকাটিকে প্রকাশের ভার নিয়েছেন তমলুকের বিশিষ্ট কংগ্রেস-কর্ম্মী শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক। তিনি আমাকে গ্রন্থকারের পর্য্যায়ে তুলে ধরলেন সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ, কিন্তু জনসাধারণ এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিতে রাজী হবেন কিনা জানি না। প্রবন্ধগুলিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার পরিকল্পনা কোন দিন মাথায় ছিল না; তাই যখন প্রকাশনের তাগিদ এলো তখন প্রবন্ধগুলিকে নূতন ধাঁচে সাজাবার চেষ্টা করার সময় পাইনি। সেজন্য আঙ্গিকের দিক থেকে ত্রুটি যথেষ্টই থেকে গেল।

ভারতের রাষ্ট্র-জীবনের ক্ষেত্রে আজ আমরা এক নূতন পর্য্যায়ে পা দিচ্ছি। পলাশীর রণক্ষেত্রে লজ্জারক্ত সূর্য্যাস্তের পর আজকের এই মুঠোমুঠো সোনা ছড়ান সূর্য্যোদয়! মাঝখানে যেন এক স্বপ্নাচ্ছন্ন বিভীষিকাময় রাত্রি! ভারতবর্ষের কোটি কোটি নরনারীর জীবনকে নূতন করে গড়বার, ভারতে ৭ লক্ষ গ্রামকে নূতন করে শ্রীসম্পদে পরিপূর্ণ করে তোলার দায়িত্ব আজ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা গ্রহণ করলাম। এই দায়িত্বকে পালন করার যোগ্যতা আমাদের আজ নেই বলে আশঙ্কা করার কারণ আছে। যে দেশে শতকরা দশজন লোকমাত্র শিক্ষিত সেদেশে যথার্থ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আজ যাঁদের হাতে এলো তাঁরা যদি দেশের যথার্থ শুভানুধ্যায়ী হন, আমলাতন্ত্রের শাসনচক্র যে পথে চলেছে সে পথকে সাহসিকতার সঙ্গে পরিহার করে যদি আমাদের জাতীয় নেতারা যে ত্যাগ ও আদর্শপরায়ণতার দ্বারা জাতির শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করেছেন সে পথেই তাঁদের

জয়যাত্রা চালিয়ে যান, তবে আমাদের হতাশ হবার কোন কারণ নেই ; কারণ জাতীয় জীবনকে স্বাধীনতার উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য যে নূতন শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন, যে সর্ব্বতোভাবে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর দরকার, তা গান্ধীজী তাঁর পরিকল্পিত 'নঈতালিমের' মধ্য দিয়ে দেশের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। জাতীয় সরকার যদি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যই আগ্রহান্বিত হন তবে তাঁদের সামনে জাতিকে নূতন অধিকার ও দায়িত্ব বোধের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলার উপায় রয়েছে। কত দ্রুত ও কত নিপুণতার সঙ্গে তাঁরা জাতিগঠনের এই উপায়কে কার্য্যকরী করে তুলতে পারেন তার পরিচয়ই হবে তাঁদের যোগ্যতার মানদণ্ড। গঠনমূলক সকল কাজের মস্তিষ্কস্বরূপ মনে করে বুনিয়াদী শিক্ষার কথা জনসাধারণের সামনে উপস্থাপিত করার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করছি।

বুনিয়াদী শিক্ষার পরীক্ষা আজ ৮ বৎসরেরও অধিক কাল ধরে চলছে। ভারতবর্ষের কংগ্রেস-শাসিত সব কয়টি প্রদেশই বুনিয়াদী শিক্ষাকে প্রাদেশিক শিক্ষাব্যবস্থারূপে গ্রহণ করার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। জাতিকে সম্পূর্ণ নূতন ভিত্তিতে স্বরাজ্য লাভের ও রক্ষার উপযুক্ত করে গড়ে তোলার পক্ষে এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও সামর্থ্য আজ স্বীকৃত হয়েছে। পুণায় বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রীদের সম্মেলনে স্বীকার করা হয়েছে যে বুনিয়াদী শিক্ষা আজ আর কেবলমাত্র পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার পর্য্যায়ে নেই ; নিঃসন্দেহভাবে একে একটি প্রগতিশীল, জাতীয়তা উদ্বোধক, বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থারূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলা দেশে ও বাংলা ভাষায় এ সম্পর্কে খুবই কম আলোচনা হয়েছে। অনেক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌কেও আমি এ সম্পার্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ দেখেছি। এ অজ্ঞতা বর্তমান অবস্থায় মারাত্মক। 'বুনিয়াদী শিক্ষার কথা' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে আমি বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে একটা রেখাচিত্র আঁকার চেষ্টা করেছি।

'আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ও নূতন পরিকল্পনা' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে আমি বুনিয়াদী শিক্ষার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেছি।

এ প্রবন্ধটিকে সুসম্পূর্ণ বলা চলে না। 'শনিবারের চিঠি'তে এই প্রবন্ধগুলি যখন লিখছিলাম তখন বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। চালু শিক্ষাব্যবস্থাকে আমার কোন দিনই ভাল লাগত না। স্কুল-কলেজ পালানো ছেলে আমি, কোন দিন কলেজিয়েট হয়ে পরীক্ষা দেবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। নেহাৎ বাড়ীর তাগিদে স্কুল-কলেজের সিঁড়িগুলির ওপর দিয়ে গড়িয়ে গিয়েছিলাম—এর মধ্যে কোথাও যদি শক্ত বাধা অতিক্রম করতে হত তবে আটকাতাম নিশ্চয়ই, কারণ পরিশ্রম করে পরীক্ষাপাশের ধৈর্য্য আমার ছিল না। তবু পরবর্ত্তীকালে অধ্যাপনার কাজ নিয়েছিলাম—অলসতার পরিপূর্ণ চর্চ্চা করা যায় বলে। আমার আসল ঝোঁকটা ছিল খেলার দিকে, পাঠ্যপুঁথির দিকে নয়। কিন্তু এক সময়ে দেখলাম খেলার জন্য পরিশ্রম করতে আটকায় না, অবসর বিনোদনের জন্য রাশি রাশি বই পড়তে অসহ্য বোধ হয় না—যত গোলমাল পাঠ্যপুস্তক আর পরীক্ষাকে নিয়ে। মনে হল বিদ্যালয়ের সঙ্গে খেলার কোন বিরোধ যদি না থাকত! নিজের হাতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এ নিয়ে পরীক্ষাও করলাম খানিকটা। এই পরীক্ষার অভিজ্ঞতা ও বুনিয়াদী শিক্ষার সঙ্গে খানিকটা পরোক্ষ পরিচয়ের ফল হচ্ছে 'শনিবারের চিঠি'তে লেখা প্রবন্ধগুলি। এর পর বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে প্রবেশ করেছি। অভিজ্ঞতার ফলে আমার মতামত আংশিকভাবে পরিবর্ত্তিত হয়েছে এবং নূতন তথ্যও হাতে এসেছে অনেক। তাই এই প্রবন্ধগুলিতে যে মূল সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হয়েছি সেগুলিকে পরিবর্ত্তন করার কোন কারণ এখনও ঘটেনি। তাই কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন না করেই এই প্রবন্ধগুলিকে জনসাধারণের সামনে উপস্থাপিত করিলাম। অদূর ভবিষ্যতে নূতন তথ্য পরিবেশনের বাসনা রইল।

সর্ব্বোপরি বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য ভালবাসার সূত্রে ঐক্যবদ্ধ এক শোষণহীন গ্রামসমাজ। বুনিয়াদী শিক্ষা মুমূর্ষু গ্রামে নব প্রাণ সঞ্চারের আশা করে। এই হিসাবে বুনিয়াদী শিক্ষা গান্ধীজীর পরিকল্পিত সমগ্র গ্রামসেবার মস্তিষ্কস্বরূপ। বিষয়টিকে এদিক থেকে বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। নানা কারণে এই গ্রন্থে এ সম্পর্কে

সবিশেষ আলোচনা সম্ভব হয়নি। 'সেবাগ্রাম' শীর্ষক প্রবন্ধে এই দিকটির একটা রেখাচিত্র আঁকবার চেষ্টা করছি। যে কাজ বহু অর্থব্যয়ে বহু কর্ম্মীর দীর্ঘ সাধনায়ও সম্ভব হয়নি তা শিক্ষার মায়াস্পর্শে কি করে সহজেই সম্ভব হল তারই একটি কাহিনী এই প্রবন্ধে রয়েছে। এই প্রবন্ধের উপাদান স্বয়ং শান্তাদেবী জুটিয়েছেন। সেবাগ্রামে তাঁর কুটিরে প্রায় একমাস একত্রে কাটিয়েছি। বহু অবিস্মরণীয় মুহূর্ত্তের আলোচনা থেকে সংগ্রহ করেছি এই প্রবন্ধের উপাদান। গান্ধীজী তাঁকে দিনের পর দিন যে সকল উপদেশ দিয়েছেন তিনি তা সযত্নে লিখে রেখেছেন। এই অমূল্য উপদেশগুলি তিনি আমাকে দেখবার সুযোগ দিয়েছিলেন। তা থেকেই বুঝতে পেরেছিলুম কী চরম সমাজতন্ত্রী সমাজের কল্পনা করেছেন গান্ধীজী। বহু সন্দেহের নিরাকরণের জন্য শান্তাদেবীকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। প্রচুর উপকরণের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার সুযোগ এই প্রবন্ধে জোটেনি ; কারণ 'চুঞ্চাপ্রকাশ'-এর সম্পাদকের তাগিদ ছিল কড়া কিন্তু সময় ছিল কম। তবু যদি এই প্রবন্ধ গঠনকর্ম্মীদের বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে পারে তবে কৃতার্থ বোধ করব।

এই সুযোগে যাঁরা আমাকে নানাভাবে সাহায্য ও উৎসাহিত করেছেন তাঁদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার সকল প্রচেষ্টার প্রেরণার যিনি উৎস ছিলেন তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই। এই অযোগ্য গ্রন্থখানি তাঁরই পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে। অজ্ঞাতকুলশীল আমাকে 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক শ্রীসজনীকান্ত দাস মশাই সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর দরজায় যদি অর্দ্ধচন্দ্র প্রাপ্তি ঘটত তবে নিজের কথা এতটা সাহস করে বলার মত সাহস আমার জুটত কিনা জানিনা। আরো অনেক সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ্ আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। তাঁদের নাম উহ্য রাখলাম কিন্তু তাঁদের আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাচ্ছি।

সাধনাশ্রম, ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ ইং
পোঃ মগরাহাট
২৪-পরগণা

নিবেদক
অনিলমোহন গুপ্ত

বুনিয়াদী শিক্ষার কথা

১৯৩৭ সালে হরিজন পত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা প্রথম জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করেন। ঐ বছর জুলাই মাসে গান্ধীজী হরিজন পত্রিকায় লিখেন, "By education I mean an all round drawing out of the best in child and man—body, mind and spirit. Literacy is not the end of education nor even the beginning. It is only one of the means whereby men and women can be educated. Literacy in itself is no education. I would, therefore, begin the child's education by teaching it a useful handicraft and enabling it to produce from the moment it begins its training. Thus every school can be made self-supporting, the condition being that the State takes over the manufactures of these schools......"

"I hold that the highest development of the mind and the soul is possible under such a system of education. Only every handicraft has to be taught not merely mechanically as is done today but scientifically, the child should know the why and wherefor of every process. I am not writing this without some confidence, because it has the backing of experience."

এতে স্পষ্টভাবে গান্ধীজী শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর ধারণা ব্যক্ত করেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে 'টলষ্টয় ফার্ম্মে' কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষার মধ্য দিয়েই তিনি নিজে দীক্ষা নিয়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে তিনি বল্লেন যে আক্ষরিক জ্ঞান তো শিক্ষার চরম কথা নয়ই এমন কি তার গোড়ার কথাও নয়; এ শুধু

মানুষকে শিক্ষিত করার একটা উপায় মাত্র। মানুষের শিক্ষা হবে কাজের মধ্য দিয়ে, সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে। প্রথম দিনটি থেকেই শিশু উৎপাদন করবে, রাষ্ট্রের সম্পদ-উৎপাদক হবে, নিরর্থক বোঝামাত্র হয়ে থাকবে না। এই শিল্পশিক্ষা যদি সার্থক হয়, শিশু যদি কেবলমাত্র যন্ত্রের মত কাজ না করে বা তাকে দিয়ে যদি যন্ত্রের মত কাজ করিয়ে নেওয়া না হয়—তবে এই কাজ করা, কাজ শেখার মধ্য দিয়েই শিশুর বৌদ্ধিক ও আত্মিক চরম বিকাশ সাধিত হবে। অন্যদিকে রাষ্ট্র যদি শিশুর তৈরী শিল্পদ্রব্য কিনে নেয় তবে বিদ্যালয়গুলি স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে।

গান্ধীজীর এই মত কেবলমাত্র সংস্কারপ্রয়াসী নয়, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে এ এক চরম বিদ্রোহের আহ্বান। সুতরাং শিক্ষাবিদ্দের টনক নড়ে উঠল। এরা মুখর হয়ে উঠলেন্ গান্ধীজীর পরিকল্পনার সমালোচনায়। প্রধানতঃ দুটি কথাকে কেন্দ্র করে সমালোচনা গভীর হয়ে উঠল : (১) কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষা, (২) স্বাবলম্বন।

'কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষা' কথাটা নূতন নয়, কিন্তু শিক্ষাবিদ্রা এই 'কর্ম্ম'কে শিশুর মনোরঞ্জনেরই একটা অঙ্গ বলে গ্রহণ করতে চাইলেন। শিশু সত্যি সত্যি শরীর খাটিয়ে উৎপাদনমূলক কাজ করবে এবং সে কাজ তাদের শিক্ষার ব্যয় জোগাবে—এটা যেন তাঁরা বরদাস্ত করতে পারলেন না। অনেকে ভয় প্রকাশ করলেন যে এ ঘটলে শিশুরা সব ক্রীতদাস আর শিক্ষকরা দাসপরিচালকে পরিণত হবেন। শিশুর প্রথম মানসিক বিকাশ কাজের মধ্য দিয়েই হয়—একথা পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান স্বীকার করেছে। সুতরাং আমাদের অধ্যাপকরা এ সত্যটা অস্বীকার করতে পারলেন না। তবে তাঁরা কাজের সংজ্ঞার মধ্যে ফেললেন শুধু তেমন কাজ যা শিশু তার খেয়ালখুশী মত করবে।

সারাবছর গান্ধীজী নিরলসভাবে তাঁর সাধ্যমত এসব প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তিনি বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে অর্থহীন কাজ—যার মধ্য দিয়ে শিশু সত্যকারের কোন প্রয়োজনীয় বস্তু সৃষ্টি করতে পারে না, তাকে কাজ বলে অভিহিত করা সঙ্গত নয়, এতে শিশুর পূর্ণ বিকাশ সাধিত হতে পারে না। কাজকে

কেবল শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে দিলেই চলবে না, কাজই হবে শিক্ষার মাধ্যম। এই কাজ করার মধ্য দিয়ে শিশু প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করবে, সমাজের ভাণ্ডারে নিজের সাধ্যমত দান করবে। এর দ্বারা নিজকে সমাজের অঙ্গ বলে জানবে এবং এই দানের মধ্য দিয়েই সে যে নিষ্প্রয়োজন নয় এ শিক্ষা তার হবে; আত্মপ্রত্যয় ও সমাজ সচেতনতা তার জন্মাবে। শিশুর শক্তিকে অপচয়িত হতে দিতে গান্ধীজী আপত্তি জানালেন। শিশু কাজ করতে চায়, কাজ করতে পারে—অথচ সে কাজ কেবল খেলা হবে একথা মানতে তিনি অস্বীকার করলেন। অনুপযুক্ত শিক্ষক শিশুর ক্ষতি করতে পারে একথা তিনি স্বীকার করলেন; কিন্তু উপযুক্তভাবে শিক্ষিত শিক্ষক শিশুর উৎপাদনকে কেন্দ্র করে তার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন এবং বিদ্যালয়ের ব্যয় সঙ্কুলান করতে পারবেন না একথা তিনি মানতে চাইলেন না। তাঁর মতে বিদ্যালয়কে স্বাবলম্বী করে তোলার পরীক্ষাই হবে শিক্ষকের যোগ্যতার চরম পরীক্ষা।

১৯৩৭ খৃঃ অব্দের ২২শে ও ২৩শে অক্টোবর ওয়ার্দ্ধায় নবভারত বিদ্যালয়ে মাড়োয়ারী এডুকেশন সোসাইটির উদ্যোগে ভারতের শিক্ষাবিদ্‌দের এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনের সামনে গান্ধীজি আবার নিজের বক্তব্য পেশ করেন। দুইদিনব্যাপী আলোচনার পর নিম্নলিখিত চারটি প্রস্তাব গৃহীত হলো:

(১) সম্মেলন মনে করে যে সমগ্র দেশে সাত বৎসরব্যাপী অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(২) শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হওয়া উচিত।

(৩) কোন উৎপাদনশীল হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা যতদূর সম্ভব দেওয়া হবে—গান্ধীজীর এই প্রস্তাব এই সম্মেলন সমর্থন করে। তবে শিশুর পরিবেশের প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দিতে হবে।

(৪) সম্মেলন আশা করে যে ক্রমে এই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য থেকেই শিক্ষকের পারিশ্রমিকের সঙ্কুলান হবে।

এই সম্মেলন দিল্লী জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার অধ্যক্ষ জাকির হোসেন সাহেবকে সভাপতি ও শ্রী ই. ডব্লিউ. আর্যনায়কম্‌কে সম্পাদক করে এক সমিতি নির্ব্বাচন করে। এই সমিতির কাজ হল উপরোক্ত মূল প্রস্তাবানুযায়ী নব পরিকল্পিত জাতীয় শিক্ষার পাঠ্যক্রম তৈরী করা এবং এই শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করা।

১৯৩৭ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে উল্লিখিত জাকির হোসেন কমিটি তাঁদের রিপোর্ট দাখিল করেন। এতে প্রথমতঃ বুনিয়াদী শিক্ষার মূল নীতিগুলি বর্ণনা করা হয়। রিপোর্ট-রচয়িতারা বলেন যে বুনিয়াদী শিক্ষা দ্বারা প্রথমতঃ কেবলমাত্র বিদ্যার্থীর মস্তিষ্ক পরিচালনার বদলে তার সমগ্র ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলা হবে (the literacy of the whole personality)। সামাজিক দিক দিয়ে এই শিক্ষা শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধার উন্মেষ করে সামাজিক বহুবিধ কুসংস্কার দূর করবে এবং জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি দৃঢ়বদ্ধ করবে। অথ নৈতিক দিক দিয়ে এই শিক্ষা জাতীয় সম্পদবৃদ্ধির সহায়ক হবে। এ শিক্ষা জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত হবে এবং বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে দৃঢ় সংবদ্ধ করবে। স্বাধীন দেশের উপযুক্ত নাগরিকরূপে গড়ে তোলার শিক্ষা এই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে রয়েছে তা এঁরা পরিষ্কারভাবে দেখান।

বিভিন্ন বিষয়বস্তু শেখায় কি লক্ষ্য থাকবে এটা এঁরা বিশদ্‌ভাবে বর্ণনা করেন। বিষয়বস্তুকে (১) মূল উদ্যোগ (Basic craft) (২) মাতৃভাষা, (৩) গণিত, (৪) সমাজবিজ্ঞান, (৫) বিজ্ঞান, (৬) চিত্রাঙ্কন, (৭) সঙ্গীত ও (৮) হিন্দুস্থানী—এই আট ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তারিত পাঠ্যক্রম দেওয়া হয় এবং কিভাবে বিভিন্ন বিষয়বস্তু মূল উদ্যোগের সঙ্গে যথাসম্ভব সংযুক্ত করে শিক্ষা দিতে হবে তারও খানিকটা উদাহরণ দেওয়া হয়।

মূল উদ্যোগ নির্ব্বাচন সম্পর্কে এই সমিতি সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ দেন। যে কোন কাজকে নির্ব্বাচন করলেই চলবে না। কাজটির শিক্ষামূল্যই হবে প্রধান বিবেচ্য। জীবনের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে মূল উদ্যোগের নিবিড় যোগ থাকা চাই। উৎপাদন মুখ্য

লক্ষ্য হবে না ; লক্ষ্য হবে মিলিতভাবে কাজ করার শক্তি, পরিকল্পনা তৈরী করার ক্ষমতা, সচেষ্টতা, দায়িত্ববোধ ইত্যাদি।

সাধারণ চলতি শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার তুলনামূলক কোন সমালোচনা সম্ভব নয়। তবু মোটামুটি বলা হয় যে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থী ৭ বৎসরের শিক্ষা শেষে ইংরাজীর পরিবর্ত্তে হিন্দীসহ আজকালকার প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ বিদ্যার্থীর সমান জ্ঞানলাভ করবে।

১৯৩৮ খৃঃ অব্দে হরিপুরার অধিবেশনে ভারতীয় জাতীয় মহাসভা বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থারূপে গ্রহণ করেন এবং জাকির সাহেব ও আর্য্যনায়কম্‌জীকে মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশ নিয়ে একটি নিখিল ভারত শিক্ষাপরিষদের প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করতে নির্দ্দেশ দেন। এই নির্দ্দেশ অনুযায়ী ১৯৩৮ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষাকে স্বাধীন ভারতের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা বলে স্বীকার করে নিলেও কিন্তু স্বাবলম্বনের প্রশ্ন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্ব্বাক রইলেন। গান্ধীজীর পরিকল্পনা থেকে এই ভাবে বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা অনেকখানি সরে এলো।

১৯৩৮ সালে ভারতের শিক্ষাজগতে বিপুল পরিবর্ত্তন সংসাধনের গোড়াপত্তন হয়। মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও বোম্বাই সরকার নূতন প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের কাজ আরম্ভ করেন, কাশ্মীর রাজ্যে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়। দিল্লীতে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, মসলিপট্টমে অন্ধ্র জাতীয় কলাশালা, পুণাতে তিলক মহারাষ্ট্র বিদ্যাপীঠ এবং আমেদাবাদে গুজরাট বিদ্যাপীঠ বুনিয়াদী শিক্ষকদের শিক্ষাদানের কাজ আরম্ভ করেন। ১৯৩৯ খৃঃ অব্দে শিক্ষকদের শিক্ষা দেবার জন্য সরকারী বে-সরকারী ১৮টি প্রতিষ্ঠান কাজ করছিল।

প্রায় দুই বৎসরের কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে ১৯৩৯এর অক্টোবর মাসে শিক্ষাবিদ্‌রা আবার পুণায় এক সম্মেলনে মিলিত হলেন। কাশ্মীরের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর কে. জি. সৈদিন সাহেব এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা

পরামর্শদাতা সমিতির প্রতিনিধিরাও এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এই সম্মেলনে বুনিয়াদী শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের কাজের বিবরণ পাঠ এবং সমালোচনা হয়। কর্ম্মীরা বাস্তবক্ষেত্রে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। দেখা গেল কাজকে অনেকক্ষেত্রে কেবলমাত্র শিক্ষার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, কোথাও কোথাও বা কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেবার চেষ্টায় জোর করে সমবায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই সম্মেলনে এজন্য সমবায় পদ্ধতি নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করা হয়। এই সম্মেলন অন্যান্য সিদ্ধান্তের মধ্যে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেন: (১) ইংরাজী শিক্ষা ভারতবর্ষের শিশুদের পক্ষে বোঝাস্বরূপ হয়েছে। সাত বছরের বাধ্যতামূলক বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে ইংরাজীর স্থান থাকবে না। (২) বুনিয়াদী শিক্ষা জাতির পক্ষে এত প্রয়োজনীয় যে যথাসম্ভব চেষ্টা করা দরকার যাতে রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্ত্তনাদির জন্য এর পরীক্ষা ও প্রতিষ্ঠা রুদ্ধ হয়ে না যায়। (৩) কলাকে শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে গ্রহণ করতে হবে। (৪) শিক্ষাদানে সমবায় পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে কিন্তু সমবায় যেন কৃত্রিম না হয়। কাজ, সমাজ ও প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে সমবায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। (৫) একজন শিক্ষককে কেবলমাত্র একজন শিল্পীর সঙ্গে জুড়ে দিলেই এই শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করা চলবে না। এ শিক্ষা চালু করতে হলে শিক্ষককে নিজেই শিল্পী হতে হবে। শিক্ষকদের শিক্ষার সময় ও পদ্ধতি সম্বন্ধেও এই সম্মেলন কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। মূল উদ্যোগ নির্ব্বাচনের সময় স্থানীয় কুটির-শিল্পের কথাও বিশেষভাবে বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালো ছায়া তখন পৃথিবীর ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। জাতীয় এবং আন্তর্জ্জাতিক এমন সঙ্কট মুহূর্ত্তে এই সম্মেলন আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সভাপতি বলেন যে কেবলমাত্র শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার খুঁটিনাটি সামান্য বিষয় আলোচনার জন্য এ সম্মেলন আহূত হয়েছে মনে করলে ভুল করা হবে। এই সম্মেলন ন্যায়, উৎপাদনশীল কর্ম্ম, পারস্পরিক সম্মান ও সহযোগিতার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত

এক নূতন শিক্ষাদর্শন জগতের সামনে উপস্থাপিত করছে। এ শিক্ষার ভিত্তির ওপর যদি নূতন সভ্যতা গড়ে ওঠে তবে সমাজে আজ যে অত্যাচার, অনাচার, ঈর্ষাদ্বেষের অন্ধকার নেমেছে তা দূরীভূত হবে। জাতীয় কংগ্রেস তখন আসন্ন সঙ্কটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস-শাসন থাকার জন্য বুনিয়াদী শিক্ষাকে এত শীঘ্র চালু করা সম্ভব হয়েছিল। এ কথা সত্য যে সরকারী চাকুরেরা নানা কারণে এই পরিশ্রমসাপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থাকে সুনজরে দেখছিলেন না। সুতরাং কর্ম্মীরাও আসন্ন পরিবর্ত্তনের কথা ভেবে বিপন্ন বোধ করছিলেন। সভাপতি এ সম্পর্কে বলেন যে, এ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্বেগ প্রকাশ করা অর্থহীন। অন্যের সাহায্যের ওপর এ শিক্ষাব্যবস্থা চিরকাল টিকে থাকতে পারে না, নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তির ওপরই বুনিয়াদী শিক্ষাকে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে হবে।

যুদ্ধের ব্যাপারে মতদ্বৈধতার জন্য বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ যথাসময়ে পদত্যাগ করলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা অনুভব করলেন যে বুনিয়াদী শিক্ষা জাতির পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। ১৯৪০এর এপ্রিল থেকে ১৯৪১এর মার্চ্চ মাসের মধ্যে বিহার ও বোম্বাই ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে সরকারের তরফ থেকে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা বন্ধ হয়ে গেল। যুক্তপ্রদেশে বুনিয়াদী শিক্ষা রূপান্তর গ্রহণ করল। বিহার ও বোম্বাইতে শুধু নির্ব্বাচিত এলাকাগুলিতে সরকার পরীক্ষা চালিয়ে যাবেন স্থির করলেন।

কিন্তু এই রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্ত্তনের ফলে বুনিয়াদি শিক্ষার অপমৃত্যু ঘটল না। উড়িষ্যায় শ্রীযুক্ত গোপবন্ধু চৌধুরীর নেতৃত্বে বে-সরকারীভাবে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ চলছিল। সরকার বুনিয়াদী শিক্ষা বন্ধ করে দেবার পর উড়িষ্যার অনেক সরকারী কর্ম্মচারী পদত্যাগ করেন এবং গোপবন্ধুবাবুর নেতৃত্বে 'উৎকল মৌলিক শিক্ষা-পরিষদ' প্রতিষ্ঠা করে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। অন্যান্য বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানও এই পরীক্ষা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও পরিচালনা করতে থাকেন।

এই অবস্থার মধ্যে ১৯৪১ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে দিল্লীর জামিয়া নগরে জামিয়া-

মিলিয়া ইসলামিয়ার আহ্বানে হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং জাকির সাহেব সভাপতিত্ব করেন। গান্ধীজী এই সম্মেলনে নিম্নলিখিত বাণী প্রেরণ করেন :

"I hope that the conference will realise that success of the effort is dependent more on self-help than upon Government, which must necessarily be cautious even when it is well disposed. Our experiment to be thorough has to be at least somewhere made without alloy and without outside interference."

১৯৪১-৪২ খৃঃ অব্দে কাজের আর কোন সম্প্রসারণ হলো না ; কিন্তু যাঁরা কাজ স্থরু করেছিলেন তাঁরা তাঁদের পরীক্ষা চালিয়ে চল্লেন। যত্নের সঙ্গে বিভিন্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদের প্রগতির বিচার করা হল। তাতে স্পষ্টভাবে দেখা গেল যে এই বিদ্যার্থীরা মূলশিল্পে যথোচিত নৈপুণ্য অর্জ্জন করছে এবং যান্ত্রিকভাবে কাজ না করে বুদ্ধির প্রয়োগ করে কাজ করার শিক্ষা লাভ করছে। এদের জড়তা ও কর্ম্মবিমুখতা বহুল পরিমাণে দূরীভূত হয়েছে, এরা সবাই মিলে সমবায় পদ্ধতিতে গুছিয়ে কাজ করতে পারে এবং নিজেদের মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় শৃঙ্খলা নিজেরাই বজায় রাখে। নিজেদের কাজের দায়িত্ব নিজেদেরই বহন করতে হওয়ায় কাজের স্থবিধা-অস্থবিধা এরা বুঝেছে, বাইরে থেকে নিয়ম চাপাবার আর দরকার পড়ে না। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল এদের জিজ্ঞাসা-প্রবণতা পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি, শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য জ্ঞান, প্রকাশক্ষমতা অনেকখানি বেড়ে গেছে।

এই সময়ে ১৯৪২এর আগষ্ট আন্দোলনের ফলে সারা ভারতবর্ষে একটা বিপুল রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্য্যয় এলো। গভীরভাবে এই আন্দোলন সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ভিত্তিকে নাড়া দিয়ে গেল। ফলে বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষতি হলো প্রচুর, এর অব্যাহত প্রগতি সাময়িকভাবে প্রায় রুদ্ধ হয়ে গেল। সরকারী পরিচালনায় কেবলমাত্র বিহারের চম্পারণ জেলায় বেতিয়া থানার অন্তর্গত ২৭টি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বুনিয়াদী শিক্ষার পরীক্ষা প্রায় অব্যাহতভাবে চল্ল। বোম্বাই

সরকার বিদ্যালয়গুলি চালিয়ে চল্লেন বটে, কিন্তু পরীক্ষা সেখানে সন্তোষজনক হয় নি। উড়িষ্যায় বে-সরকারী কর্ম্মীরা প্রায় সকলেই কারাপ্রাচীরের অন্তরালে আশ্রয় পেলেন। দেশীয় রাজ্যের মধ্যে কেবলমাত্র কাশ্মীরে কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ হল।

এই অবস্থার মধ্যেই বিহার সরকার পাটনা ট্রেণিং কলেজের অধ্যাপক এন্. সি. চ্যাটার্জ্জি কর্ত্তৃক সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়, মিশনারীদের পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিক্ষা সম্পর্কে ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান-সম্মত তুলনামূলক বিচারের ব্যবস্থা করেন। ১৯৪৩ সালের ১১ই মার্চ্চ তারিখে এই পরীক্ষা স্থরু হয়। ফলাফলের খানিকটা নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

মৌখিক পড়ার ফলাফল

বিদ্যালয় ও শ্রেণী	১৪২ শব্দের একটি অংশ পড়তে কত সময় লেগেছে	পড়াতে গড় ভুলের সংখ্যা
প্রাথমিক বিদ্যালয়—৪র্থ শ্রেণী	১ মি. ৩৮˙৩ সেঃ	৭˙৩৫
বুনিয়াদী বিদ্যালয়—৪র্থ শ্রেণী (সিনিয়র)	১ মি. ২৯˙৬ সেঃ	৩˙৬
চুহারী মিশন বিদ্যালয়—৪র্থ শ্রেণী	১ মি. ৩৭˙৬ সেঃ	৫˙৬
প্রাথমিক বিদ্যালয়—৩য় শ্রেণী	২ মি. ১৩˙৪ সেঃ	১০˙৮
বুনিয়াদী বিদ্যালয়—৪র্থ শ্রেণী (জুনিয়র)	২ মি. ১৩˙৭ সেঃ	৬
চুহারী মিশন—৩য় শ্রেণী	২ মি. ৩২˙৪ সেঃ	২৩

বিভিন্ন বিষয়ের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল

বিদ্যালয় ও শ্রেণী	মাতৃভাষা	গণিত	বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যরক্ষা	সমাজবিজ্ঞান
	পূর্ণ নং ৬৪	পূর্ণ নং ২২	পূর্ণ নং ৭১	পূর্ণ নং ৪৩
প্রাথমিক বিদ্যালয়—৪র্থ শ্রেণী	৩৫.৩	১০.৫	২৬	১৩.৬
বুনিয়াদী বিদ্যালয়—৪র্থ শ্রেণী (সিনিয়র)	৩৮.৭	১৩	৪৮	২৫.৬
চুহারী মিশন—৪র্থ শ্রেণী	৩৭	১৪.৭	৪০.৩	১৯.৫
প্রাথমিক বিদ্যালয়—৩য় শ্রেণী	২৫.৩	৪.৭	...	...
বুনিয়াদী বিদ্যালয়—৪র্থ শ্রেণী (জুনিয়র)	২৬	৮.৭	...	...
চুহারী মিশন—৩য় শ্রেণী	২৯.৮	৬.৭	...	...

এখানে একটা প্রধান লক্ষ্য করার বিষয় এই যে লেখাপড়া যথেষ্ট শেখানো হয় না বলে সাধারণতঃ বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও শিক্ষা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয় সেটা কত মিথ্যে। এই পরীক্ষা থেকে দেখা যায় যে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীরা লেখাপড়ার নির্ভুলতা, দ্রুততা, বিষয়বস্তুর জ্ঞান ও প্রকাশ ক্ষমতা সব কিছুতেই সাধারণ বিদ্যালয়ের ছেলেপিলের চাইতে অনেক এগিয়ে আছে। এই ফলাফল থেকে আরো একটা জিনিষ স্পষ্টভাবে লক্ষ্যণীয়—সেটা হচ্ছে এই যে বুনিয়াদী শিক্ষার ভিতর দিয়ে বিদ্যার্থীরা যত এগিয়ে যায় ততই তাদের উন্নতি দ্রুততর এবং স্পষ্টতর হতে থাকে। তার কারণ এই যে বুনিয়াদী শিক্ষা বিদ্যার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্ব বাড়িয়ে দেয়; ফলে শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল না হয়ে বিদ্যার্থী নিজের মনের আনন্দে জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করতে থাকে। এজন্যই যত সে এগিয়ে যায় সাধারণ বিদ্যালয়ের সঙ্গে এর তফাৎ ততই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতির রিপোর্ট প্রকাশিত হল। এই রিপোর্ট সাধারণতঃ সার্জেণ্ট পরিকল্পনা নামে অভিহিত। ভারতসরকারের তদানীন্তন শিক্ষা উপদেষ্টা স্যার জন সার্জেণ্টএর নামানুসারেই এই পরিকল্পনার নামাকরণ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা ভারতের সমগ্র শিক্ষা নীতি ও ব্যবস্থাকে নূতন করে ঢেলে সাজাবার পরিকল্পনা। এই রিপোর্ট নানা কারণে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই রিপোর্টে জোর করে বলা হ'ল যে অর্থের জন্য সরকারের পক্ষে কোন শিক্ষা পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করা অসম্ভব হওয়া উচিত নয়। দেউলে ঋণ-প্রপীড়িত ভারত প্রয়োজন পড়লে যুদ্ধের জন্য কোটি কোটি টাকা জোগাতে পারে এ তখন সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তাই সার্জেণ্ট বললেন যে সরকার যদি সার্ব্বজনীন শিক্ষার সর্ব্বাধিক প্রয়োজন অনুভব করেন তবে সরকার যে ভাবেই হোক সে অর্থ সংগ্রহ করতে সক্ষম হবেন। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি দ্বারা নির্ব্বাচিত খের কমিটি ভবিষ্যৎ প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত পরিকল্পনা রচনা করেন। বোম্বাইর প্রধান ও শিক্ষামন্ত্রী শ্রী বি. জি. খেরের নামানুসারে এই কমিটির নামাকরণ হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধানতঃ বুনিয়াদী শিক্ষার নীতি মেনে নিলেও তিনটি মূল বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। এই সমিতি বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনায় ৭ বৎসরের অবৈতনিক আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার পরিবর্ত্তে ৮ বৎসরের শিক্ষার সুপারিশ করেন। কিন্তু এই শিক্ষা-কালকে এঁরা দুই পর্য্যায়ে ভাগ করেন এবং প্রথম পাঁচ বৎসর পরে শতকরা ২০ জন বিদ্যার্থী বিভিন্ন প্রকারের হাইস্কুলে যেতে পারবে এই মত প্রকাশ করেন। সুতরাং বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনায় ৭ বৎসর ব্যাপী অবিচ্ছেদ্য শিক্ষাকে এঁরা মেনে নেন নি। দ্বিতীয়তঃ এঁরা কাজ নির্বাচনের বেলায় নিম্ন প্রাথমিক স্তরে অর্থাৎ প্রথম পাঁচ শ্রেণীতে—বিবিধ প্রকার কাজ দেবার প্রস্তাব করেন। বুনিয়াদী শিক্ষার এক মূল উদ্যোগের মারফতে শিক্ষা দেবার নীতি থেকেও এই প্রস্তাব ভিন্ন। তৃতীয়তঃ এই সমিতির সব চেয়ে বড় আপত্তি ছিল বুনিয়াদী শিক্ষার স্বাবলম্বনের

প্রশ্ন সম্পর্কে। এরা বলেন যে শিক্ষা কোন স্তরেই, বিশেষতঃ প্রাথমিক স্তরে, স্বাবলম্বী হতে পারে না এবং হওয়া উচিত নয়। এঁদের মতে শিক্ষাকে স্বাবলম্বী করতে গেলে শিশুর ক্ষতি হবে। স্বাবলম্বন সম্পর্কে জাকির হোসেন কমিটি ছিলেন নিমরাজী, কংগ্রেস নীরব, কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি করলেন এই প্রস্তাবের সবাক বিরোধিতা।)

১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত বুনিয়াদী শিক্ষার ইতিহাসে একটি উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা হচ্ছে—বাংলাদেশে বুনিয়াদী শিক্ষার গোড়াপত্তন। যুদ্ধ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মানুষের তৈরী দুর্ভিক্ষ—সব কিছুতে মিলে তখন বাংলাদেশের ওপর একটা চরম দুর্ভাগ্যের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। একদিকে চলেছে অসহায় বুভুক্ষু নরনারীর আকুল আর্ত্তনাদ—এদের প্রাণের স্রোতে দুর্ব্বার ভাঁটার দুর্ব্বিষহ টান, অন্যদিকে কালোবাজারের কালো টাকার স্রোতে প্রচণ্ড উজান; একদিকে স্বাধীনতাকামী অগণ্য নরনারীর মরণজয়ী পণ, অন্যদিকে সরকারের চরম নিষ্পেষণ। এই দোটানার মধ্যে তখন বাংলাদেশের প্রাণশক্তি নির্ব্বাপিতপ্রায় হয়ে এসেছে। শেয়াল কুকুরের মত বেঁচে থাকার জড়স্থূল দৈহিক চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই প্রায় তখন অবশিষ্ট নেই। বিরাট দুর্ভিক্ষের কালোছায়া বাংলার সমগ্র প্রাঙ্গণকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কত লক্ষ লোক যে এই দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারালো তা সঠিকভাবে নির্দ্দেশ করা কঠিন। কিন্তু যারা মরে বাঁচল তার চাইতেও যারা সর্ব্বস্ব হারিয়ে বেঁচে রইল, তাদের অবস্থা হল আরও দুর্ব্বিষহ। অসহায় বিভ্রান্তদৃষ্টি কঙ্কালসার শিশুর দল সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিল। এদের জন্য অন্নসত্র, লঙ্গরখানা খোলা হল; কিন্তু সমস্যার সমাধান কিছুমাত্র হল না। এদের পুনর্বসতির প্রশ্ন, এদের সমাজের প্রয়োজনীয় নাগরিক করে গড়ে তোলার সমস্যা রইল অমীমাংসিত। এই সময় অখিল ভারত শিশুরক্ষা সমিতি গঠিত হয়। এঁরা নিরাশ্রয় শিশুদের নিয়ে বিভিন্ন স্থানে শিশুসদন স্থাপন করেন। এ সময়ে কারান্তরাল থেকেও দু'চারজন কর্ম্মী বেরিয়ে আসতে থাকেন। দুর্ভিক্ষগ্রস্ত শিশুদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে এঁদের

প্রথমেই মনে হলো যে এদের স্থায়ী উন্নতির বিধান করা যায় কি করে! মৃত্যু-পথযাত্রীদের কেবলমাত্র কোনমতে বাঁচবার উপায় করেই এঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না, কি করে উপযুক্ত শিক্ষার মধ্য দিয়ে এদের মানুষ করে তোলা যায়, স্বাবলম্বী করে গড়া যায়, এ প্রশ্নই তাঁদের মনে মুখ্য হয়ে দেখা দিল।

ফলে গঠনমূলক কর্ম্মীদের মধ্যে বুনিয়াদী শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষা করার প্রশ্ন জাগল। শ্রীযুক্তা লাবণ্যলতা চন্দ তখন এ নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করার জন্য সেবাগ্রামে যান। তারপরেই বাংলাদেশের শিক্ষকদের বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য ঝাড়গ্রামে একটি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়। ২৩ জন শিক্ষক তিন মাসের জন্য শিক্ষা নেবার জন্য মিলিত হন। কিন্তু সমস্যা হল শিক্ষকের। ইংরাজীশিক্ষায় মনেপ্রাণে দীক্ষিত বাংলার শিক্ষাবিদ্‌রা বুনিয়াদী শিক্ষাকে গ্রহণ করেন নি, এমন কি একটা নূতন শিক্ষানীতি হিসাবে একে পরখ করে দেখার মনোবৃত্তিও এঁদের জন্মায় নি। সুতরাং শিক্ষকের জন্য পরের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘ এই শিক্ষাশিবির পরিচালনা করার জন্য সঙ্ঘের সহসম্পাদিকা শ্রীযুক্তা আশা আর্য্যনায়কম্ ও শ্রীশ্রীনারায়ণজীকে অনুমতি দিলেন। তিন মাস শিক্ষা গ্রহণের পর বিদ্যার্থীরা ১৯৪৪ খৃঃ অব্দের ২রা অক্টোবর ৮টি শিশুসদনে এবং ৩টি গ্রাম্য বিদ্যালয়ে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বৎসরই সেবাগ্রামে শিক্ষকতার শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য আরো ২৬ জন বিদ্যার্থীকে পাঠান হয়।

১৯৪২ খৃঃ অব্দের অগষ্ট মাসে 'ভারত ছাড়' প্রস্তাবের রচয়িতা ও এই আন্দোলনের নেতা হিসাবে গান্ধীজী ও কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে বন্দী করা হয়। ১৯৪৪ খৃঃ অব্দে অসুস্থতার জন্য গান্ধীজীকে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি তখন কঠিন রোগাক্রান্ত, জীবনসঙ্গিনী কস্তুরবা এবং ভৃত্য-সেবক-বন্ধু-পার্শ্বচর মহাদেব দেশাইর মৃত্যুশোকে মুহ্যমান। কিন্তু তাঁর উদার হৃদয় তখনও ভারতবর্ষের বৃহত্তর স্বার্থের চিন্তায় মগ্ন, দুঃখ-শোক-অনাচার-অত্যাচার-জর্জ্জরিত দেশমাতৃকার মুক্তিপথ সন্ধানে রত।

দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনে গঠনমূলক কর্ম্মের অপরিহার্য্যতা সম্বন্ধে আরো কৃতনিশ্চয় হয়ে এবার তিনি বেরিয়ে এলেন। মুক্তিলাভের পর প্রায় সর্ব্বপ্রথমেই তিনি বল্লেন—"কারাগারে থাকাকালীন আমি নৈতালিমের সম্ভাবনার কথা গভীরভাবে ভেবেছি এবং আমার মন উদ্বেল হয়ে আছে।" তিনি বারে বারে বল্লেন যে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা যতটুকু এগিয়েছি ততটুকুতে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। শিক্ষার ক্ষেত্রকে প্রশস্ততর করতে হবে। শিশুকে শিক্ষা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার গৃহে প্রবেশ করতে হবে, তার মাতাপিতার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এরি মধ্য দিয়ে সমগ্র গ্রাম্য-সমাজ—সমগ্র ভারতবর্ষ—সজাগ সচেতন হয়ে উঠবে; তবেই আসবে সত্যিকারের মুক্তি, সত্যিকারের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন। শ্রীমতী শান্তা নারুলকরকে সেবাগ্রামের কাজে নিয়োগ করার সময়ও তিনি এই উপদেশই দেন। তিনি বলেন যে বুনিয়াদী শিক্ষক নিজের কর্ম্মক্ষেত্র কেবল বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবেন না। শিক্ষককে শিক্ষার দৃষ্টি নিয়ে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের সকল সমস্যার সমাধানের জন্য তৈরী থাকতে হবে। শিক্ষক সত্যি সত্যিই হবেন গ্রামের গুরু, গ্রামের বন্ধু, গ্রামের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল উৎস।

১৯৪৫ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে সেবাগ্রামে তালিমী সঙ্ঘের উদ্যোগে আবার একটি শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অসুস্থ থাকা সত্বেও গান্ধীজী এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। অসুস্থতার জন্য তাঁকে মৌন থাকতে হয়। সম্মেলনের সভাপতি জাকির হোসেন সাহেব তাঁর লিখিত বাণী পাঠ করেন। এই বাণীর মধ্যেই বুনিয়াদী শিক্ষার নূতন পর্য্যায় সুরু হওয়ার সূচনা ছিল।

তিনি বল্লেন—"এতদিন আমরা সুরক্ষিত উপসাগরে ছিলুম, আমাদের কাজের সীমা সুনির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞাবদ্ধ ছিল। আজ আমরা নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে খোলা সমুদ্রে এসে পড়লুম। এই মুক্ত সমুদ্রে আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক হচ্ছে গ্রাম্য কুটির-শিল্পের ধ্রুবতারা। আমাদের কাজ আর সাত থেকে চৌদ্দ বছরের শিশুর মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। নঈ তালিম বা নূতন শিক্ষাব্যবস্থাকে আজ জন্মমুহূর্ত্ত

থেকে মৃত্যুর ক্ষণ পর্য্যন্ত সকল পর্য্যায়ের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কাজ বাড়ল অনেক, কিন্তু পুরোণো কর্ম্মীদের নিয়ে কাজে এগুতে হবে।"

এই সম্মেলনের পর তালিমী সঙ্ঘ প্রৌঢ়শিক্ষা, প্রাক্‌বুনিয়াদী শিক্ষা এবং উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষার পদ্ধতি, নীতি, পাঠ্যক্রম ইত্যাদি রচনার জন্য বিভিন্ন উপসমিতি নিয়োগ করেন। এই সকল উপসমিতি তাঁদের সুপারিশ পেশ করেছেন এবং সেগুলি তালিমী সঙ্ঘ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়েছে।

১৯৪৫এর সম্মেলনের পর বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ আবার দ্রুতবেগে অগ্রসর হচ্ছে। সরকার কর্ত্তৃক বুনিয়াদী শিক্ষার কার্য্যপরিচালনা বন্ধ করার পর মাদ্রাজে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। ১৯৪৫এর জুলাই মাসে হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘের সহকারী সম্পাদক শ্রী জি. রামচন্দ্রন্ কর্ত্তৃক তামিলনাদের অন্তর্গত তিরুচেংগুড-এ একটি শিক্ষক শিক্ষা-শিবির প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকরা তামিলনাদে ১০টি বুনিয়াদী বিদ্যালয় পরিচালনা করছেন। তা ছাড়া কস্তুরবা স্মারকনিধি এবং মাদ্রাজ সরকারের বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রেও এঁদের কেউ কেউ কাজ করছেন।

১৯৪৬এর ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রী জি. রামচন্দ্রনের সহায়তায় অন্ধ্রদেশের কোনেটি-পুরমে একটি শিক্ষক শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই কেন্দ্রে ৩৭ জন শিক্ষক শিক্ষালাভ করেছেন এবং অন্ধ্রদেশের বিভিন্ন ফিরকায় তাঁরা কাজ করছেন।

১৯৪৬এর জুলাই মাসে বাঙ্গালোরের নিকটবর্ত্তী কেঙ্গরী গুরুকুল আশ্রমে মহীশূরের শিক্ষক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানেও ২৩ জন বিদ্যার্থী শিক্ষা-লাভ করছেন।

বাংলাদেশে ১৯৪৫এর নভেম্বর মাসে মেদিনীপুরের অন্তর্গত বলরামপুর গ্রামে বুনিয়াদী শিক্ষার বিভিন্ন পর্য্যায়ের কাজ পরীক্ষামূলকভাবে করার জন্য এবং বুনিয়াদী শিক্ষকদের শিক্ষা দেবার জন্য একটি কেন্দ্র খোলা হয়। এখানে প্রথম ২৩ জন শিক্ষকের একটি দল ৬ মাসের জন্য শিক্ষা লাভ করেন ২১ জন বিদ্যার্থীর ২য় একটি দলকে

১ বৎসরের জন্য শিক্ষাদান চলছে। বাংলাদেশে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে এখন ২০টিতে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বর্ত্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার জন্য বাংলাদেশের কাজের অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বাংলাদেশে গঠনকর্মীর সংখ্যা মুষ্টিমেয়। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিও এ পর্য্যন্ত সক্রিয়ভাবে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ হাতে তুলে নেন নি। অন্যদিকে সরকারী উদাসীনতা, প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ, সাম্প্রদায়িক বীভৎসতা, আর্থিক অনটন প্রভৃতি বুনিয়াদী শিক্ষার কাজে দুর্লজ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৯৪৬ এর মার্চ্চ এপ্রিল মাসে ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই জনপ্রিয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রীরা বোম্বাইএর শিক্ষামন্ত্রী শ্রী বি. জি. খেরের আহ্বানে মিলিত হন। তাঁরা বুনিয়াদী শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে একমত হন এবং নিজ নিজ প্রদেশে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করেন :

(১) এই সম্মেলন মনে করে যে বুনিয়াদী শিক্ষা পরীক্ষামূলক পর্য্যায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারকে এই অনুরোধ জানাচ্ছে যে, তাঁরা যেন স্ব স্ব প্রদেশে ব্যাপকভাবে এই শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করতে তৎপর হন।

(২) এই সম্মেলনের এই অভিমত যে, বুনিয়াদী বা অন্য যে কোন শিক্ষা-ব্যবস্থাতেই হোক্, সাত বছর পূর্ণ শিক্ষালাভ করার আগে শিশুর পাঠ্যসূচীতে ইংরাজীর কোন স্থান থাকবে না।

(৩) এই সম্মেলনের অভিমত এই যে শিশুর স্বাস্থ্যমঙ্গল—উপযুক্ত আহার, প্রতিষেধক ও আরোগ্যকারী চিকিৎসাব্যবস্থা, স্বাস্থ্যরক্ষার অভ্যাস গঠন—যে কোন জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। য়াতে বুনিয়াদী ও অবুনিয়াদী সকল বিদ্যালয়েই এই কর্ম্মসূচী চালু করার ব্যবস্থা করা হয় সেদিকে যথাযোগ্য দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

এই সম্মেলনের পর বিভিন্ন প্রদেশে দ্রুতগতিতে কাজ অগ্রসর হচ্ছে। বিহার সরকার তাঁদের বিগত আট বৎসরের অভিজ্ঞতার ভিত্তির ওপর ব্যাপকভাবে কাজ

আরম্ভ করার পরিকল্পনা নিয়েছেন। মাদ্রাজের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, আসাম নূতন করে শিক্ষক শিক্ষা-কেন্দ্র খোলার জন্য সেবাগ্রাম ও দিল্লীর জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়াতে বিদ্যার্থী পাঠিয়েছেন। আসাম সরকার ৯টি শিক্ষক শিক্ষা-কেন্দ্র ও প্রায় ৪০৫টি বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলার একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়েছেন। আসামে গঠনকর্মীদের নিয়ে একটি বে-সরকারী বুনিয়াদী শিক্ষাসমিতি গঠিত হয়েছে। এঁরাও শিবসাগর জেলায় অবিলম্বে একটি শিক্ষক শিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবেন এবং তাঁরা আশা করেন যে এক বৎসরের মধ্যে ২৩টি কেন্দ্রে বে-সরকারীভাবে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ সুরু হবে।

এভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে নূতন শিক্ষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যখন দ্রুত অগ্রগমনের কাজ চলছে তখনো বাংলা নির্জ্জীবভাবে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা কোন দিন সমগ্র ভারতবর্ষের অগ্রদূত ছিল; কিন্তু আজ পুরাতন সংস্কারের ক্লেদাক্ত জড়তা তাকে পরিপ্লুত করে রেখেছে। পুরাতন গতানুগতিকতা ছেড়ে নূতনকে গ্রহণ করার মত সজীবতা নেই; দাসত্ব-জনয়িতা, জাতীয়তার বিকাশের পরিপন্থী, বহুদোষদুষ্ট চলতি শিক্ষাব্যবস্থাকে ত্যাগ করে নূতন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করার সাহস নেই। অথচ এই বাংলাদেশেই রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিগুলি সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে গেছেন, বার বার বলে গেছেন শিক্ষার দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে না পারলে জাতির মুক্তি নেই। বুনিয়াদী শিক্ষার নীতিগুলি রবীন্দ্রনাথেরই বারে বারে বলা বাণীর পূর্ণতর প্রতিধ্বনি। আমরা কবিকে হয়ত বাহিক সম্মান দেখিয়েছি কিন্তু তাঁর জীবিতাবস্থায় যেমন তাঁর মর্ম্মবাণীকে অবজ্ঞা করেছি তেমনি আজও করছি। শিক্ষার বাহন, শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, রাশিয়ার চিঠি ইত্যাদি গ্রন্থে কবি তাঁর দুঃখের কথা বার বার জানিয়ে গেছেন।

ইংরাজী শিক্ষা ইংরাজের জমিদারী রক্ষার জন্য নায়েব গোমস্তা তৈরী করার প্রয়োজনের তাগিদে চালু হয়েছিল। মোটা মাইনের নায়েব গোমস্তা নিয়োগ করে ইংরাজ বহুদিন যাবৎ ভারতের সন্তানদের মধ্যে ভেদ, পারস্পারিক ঈর্ষা, অন্যায়

প্রতিযোগিতা বাঁচিয়ে রেখেছে। আজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর্ম্মচারী তৈরী হওয়ায় বেকার সমস্যা উৎকটভাবে দেখা দিয়েছে। চাকুরীর বাজারে কাড়াকাড়ির মত্ততায় আমরা শেয়াল কুকুরকেও লজ্জা দিয়েছি। তবু শিক্ষার এই শূন্যগর্ভ দিকটা আমাদের চোখে পড়ছে না এটাই আশ্চর্য্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েও আমরা কিছুই করতে শিখছি না, নিজের জীবনের ভার বহন করার মত সামর্থ্যও আমাদের জন্মাচ্ছে না, আমাদের মানসিক ঔদার্য্য কিছুমাত্র বাড়ছে না—এতেও আমাদের দৃষ্টি অবারিত হচ্ছে না। এজন্য বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও লোকে ব্যাঙ্কের চাকরী করতে ছুটে, ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে চাকরী না জুটলে চোখে অন্ধকার দেখে, আর সাধারণ কলার পরীক্ষোত্তীর্ণ বিদ্যার্থীদের কথা না বলাই ভাল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা একশো বছর আগে পুরোণো, অকেজো বলে পরিত্যক্ত হয়েছে আমরা আজও সেই ব্যবস্থা নিয়েই মেতে আছি।

নূতন করে আজ শিক্ষাকে গড়বার সময় এসেছে, নূতন মান নির্দ্ধারণের সময় এসেছে। হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘ এই সময়োচিত কাজেই আত্মনিয়োগ করেছেন। দীর্ঘ পরীক্ষার পর ১৪ বৎসরের কিশোরের কি কি জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি অর্জ্জন করা উচিত ও সম্ভব তার একটা তালিকা তাঁরা তৈরী করেছেন। প্রবেশিকার মানের সঙ্গে তুলনা করা চলে কিনা তা পাঠকরা বিচার করবেন। ৬ থেকে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত আট বছর বুনিয়াদী শিক্ষা লাভ করার পর বিদ্যার্থীরা নিম্নলিখিত গুণগুলির অধিকারী হবেন বলে আশা করা যায়:

(১) সুগঠিত, স্বাস্থ্যপূর্ণ, চটপটে দেহ হবে এদের। এরা কঠিন শারীরিক শ্রম করতে পারবে।

(২) গ্রাম অর্থনীতিতে কুটির-শিল্পের স্থান এবং নব-পরিকল্পিত গ্রাম কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পিছনে যে জীবন দর্শন আছে সে সম্পর্কে এরা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করবে।

(৩) যদি প্রয়োজন পড়ে তবে যে মূল উদ্যোগ এরা বিদ্যালয়ে শিখবে

তদ্দ্বারাই এরা নিজেদের সুসম খাদ্য ও পরিধেয়ের ব্যবস্থা নিজের শ্রমে করতে পারবে।

(৪) এরা কার্পাস থেকে বস্ত্র তৈরীর সকল প্রক্রিয়াই শিখবে।

(৫) নিজেদের সুসম খাদ্যের জন্য যথেষ্ট শাকসব্জী এরা উৎপন্ন করতে পারবে।

(৬) এরা রান্না করার নিপুণতা ও তৎসম্পর্কিত সকল প্রক্রিয়ার জ্ঞান লাভ করবে। কি করে আহার্য্য ভাঁড়ারে রাখতে হয়, রাঁধতে হয়, পরিবেশন করতে হয় তা এরা শিখবে এবং রান্নাঘর সম্পর্কিত সমুদয় হিসাব-পত্র রাখা ও বাজেট তৈরী করতে সক্ষম হবে।

(৭) খাদ্য-বিজ্ঞান এবং ব্যক্তিগত ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত মূল তত্ত্বগুলি সব শিখবে।

(৮) এরা প্রাথমিক চিকিৎসা, সাধারণ রোগের পরিচর্য্যা ও চিকিৎসা করতে শিখবে।

(৯) এরা সমবায় সমিতি পরিচালনার নীতিগুলি শিখবে, সমবায় ভাণ্ডার পরিচালনা ও তার হিসাব-পত্রাদি রাখতে শিখবে।

(১০) এরা সুস্পষ্ট ভাষায় দ্রুত জনসভাতে বক্তৃতা দিতে পারবে।

(১১) এরা সুস্পষ্ট ভাষায় নিজের মনোভাব লিখিত ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে এবং বিবরণাদি লিখতে পারবে।

(১২) মাতৃভাষায় ভাল সাহিত্যের রসগ্রহণ এরা করতে পারবে এবং হিন্দুস্থানীতে কাজ চালাবার মত জ্ঞান এদের থাকবে।

(১৩) সরল হিন্দুস্থানী এরা দেবনাগরী ও উর্দ্দু উভয় হরপে লিখতে ও পড়তে পারবে।

(১৪) এরা সমবেত প্রার্থনা করতে ও জাতীয় সঙ্গীত গাইতে শিখবে।

(১৫) চিত্রের রসগ্রহণের ক্ষমতা ও চিত্রাঙ্কণে দক্ষতা এদের জন্মাবে।

(১৬) এরা বাইসাইকেল ও ঘোড়া চড়তে এবং গরুর গাড়ী চালাতে শিখবে।

(১৭) এরা বিদ্যালয়ের ও গ্রামের উৎসব পরিকল্পনা ও পরিচালনা করতে শিখবে।

(১৮) সাময়িক পত্রিকাদি পাঠ এবং আলোচনার মধ্য দিয়ে এরা জগতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞানলাভ করবে।

(১৯) বিভিন্ন যন্ত্রপাতির যন্ত্রবিজ্ঞান এরা শিখবে।

(২০) তূলা উৎপাদন, রান্না, মূল উদ্যোগ, বাগানের কাজ, ব্যক্তিগত ও গ্রাম স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এরা মৌলিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির সঙ্গে পরিচিত হবে।

(২১) অন্নবস্ত্র সম্পর্কিত প্রক্রিয়াদির মধ্য দিয়ে এরা ভারত ও পৃথিবীর ভূগোলের সঙ্গে পরিচিত হবে।

(২২) এরা বুদ্ধিযুক্তভাবে সংবাদপত্র ও পত্রিকাদি ব্যবহার করতে পারবে।

(২৩) ভারতবর্ষের জাতীয়তার ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান এদের জন্মাবে।

(২৪) এরা বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে এবং সাম্প্রদায়িক সংহতির জন্য উদ্যোগী হবে।

(২৫) এরা বর্ণভেদের কুসংস্কার মুক্ত হবে।

(২৬) গ্রাম্য ও গ্রাম্য পরিবেশের প্রতি এদের ভালবাসা থাকবে এবং গ্রামে থেকে গ্রামের সেবা করার জন্য এরা উন্মুখ থাকবে।

এই নূতন মানের সঙ্গে মামুলী বিদ্যালয়ের মানের তুলনা করা নিরর্থক। আজ আমাদের স্থিরভাবে চিন্তা করতে হবে কোন রকম ভবিষ্যৎ নাগরিক আমরা চাই— পরীক্ষার ভারে নিষ্পেষিত, পুঁথিগতপ্রাণ, সংবাদসর্ব্বস্ব প্রাণহীন নাগরিক নয়, পরন্তু স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, কর্ম্মতৎপর, গ্রামাভিমুখী যুবক-যুবতী। ভারতে নূতন শিক্ষার দুর্ভাগ্য এই যে এর পরিকল্পনা করেছেন রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রের একজন নেতা এবং একে প্রথম জাতীয় শিক্ষারূপে স্বীকার করে নিয়েছেন একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক দল। এই রাজনৈতিক সম্পর্কের জন্য আমরা এখনো এই শিক্ষাব্যবস্থাকে নিরপেক্ষভাবে দেখতে পারছি না। আমাদের বর্তমান সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতাকে জয় করতে হবে, জাতির ভবিষ্যৎ গড়ার একটি উপায়রূপে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে দেখতে হবে। যেখানে

বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ সুরু হয়েছে সেখানেই ব্যাপকতর সমাজদেহে এর প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে দেখা গেছে। বিহারের পরিদর্শকরা বার বার স্বীকার করেছেন যে সমগ্র গ্রামে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের মারফতে কর্ম্মমুখরতা এসেছে, কুসংস্কারের অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হচ্ছে, জনসাধারণ বিরোধিতার বদলে সহযোগিতা করতে সুরু করেছে। কাশ্মীর মুসলমানপ্রধান দেশ। সেখানকার সরকারী বিবরণীতে দেখতে পাই যে বুনিয়াদী শিক্ষা সেখানকার সমগ্র গ্রাম সমাজে নূতন চেতনা এনেছে, শিক্ষার প্রতি মর্য্যাদাবোধ উদ্দীপ্ত হয়েছে, গ্রাম সমাজে সংহতি এসেছে। বাংলাদেশেও আমরা এই একই সত্য উপলব্ধি করেছি। বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্য দিয়ে গ্রাম সমাজে সুস্পষ্ট পরিবর্ত্তন এসেছে, গ্রাম পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠছে, স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি সজাগ হচ্ছে। এই শিক্ষার সুদূরপ্রসারী ফলাফলের দিকে চোখ মেলে চাইবার সময় আমাদের এসেছে। এখনও যদি আমরা এই পরিবর্ত্তনকে গ্রহণ করতে স্বীকৃত না থাকি তবে আমাদের স্তূপীকৃত দুর্ভাগ্য বিরাটতর হবে।

বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা ও বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা

এক

গত মহাযুদ্ধের পর প্রগতিশীল সকল রাষ্ট্রই নূতন শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে পরীক্ষা করতে সুরু করেছিলেন। শিক্ষা যে একটা সমগ্র জাতিকে কতখানি প্রভাবিত করতে পারে, তা অনেক দেশেই মনীষী এবং সংগঠকরা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই মোটামুটিভাবে গত মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী কালকে আমরা নূতন শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনার ও প্রবর্ত্তনের একটা যুগ-সন্ধিক্ষণ বলে মনে করতে পারি।

আমাদের দেশে শিক্ষার অভাব ও শিক্ষাব্যবস্থার গলদ আমাদের দেশের নানাশ্রেণীর লোকের মনেও একটা অস্বস্তির সৃষ্টি করেছিল। আমরাও অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যার স্বল্পতা দেখে উদ্বিগ্ন বোধ করছিলাম। তা ছাড়া স্কুল-কলেজের পাশ-করা ছেলেমেয়েরা জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারছে না, বেকার-সমস্যা ক্রমাগতই বেড়ে যাচ্ছে, এসব লক্ষ্য করেও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার কোথাও গলদ আছে—এই সন্দেহটাই মনে জাগছিল। কিন্তু অন্যান্য দেশ যেমন তাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে আগাগোড়া বিশ্লেষণ করে নূতন ছাঁচে গড়ে তুলছিল, তেমনভাবে আমাদের ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করবার বা সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে নূতন করে গড়ে তোলার আয়োজন আমরা করি নি। আমাদের দেশটা গরীবের, ছেঁড়া কাপড় আমরা জোড়াতালি দিয়ে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। ছোঁড়া-খোঁড়া শিক্ষাব্যবস্থাকেও আমরা জোড়াতালি দিয়েই ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা করেছিলাম। আমাদের মুখুজ্জে মশাই তাঁর বিরাট শক্তিকে নিয়োজিত করেছিলেন স্কুল-কলেজের সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়ে তুলতে, পাশ্চাত্যের অনুকরণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পর বিশ্ববিদ্যালয় খাড়া করে তুলতে। তাঁর এই প্রচেষ্টাকে অনুসরণ

করেই আমরা এতদিন পর্য্যন্ত প্রধানতঃ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের চেষ্টা করেছি। আমরা কখনও সন্দেহ করি নি যে, গলদটা আমাদের ব্যবস্থার মধ্যেই রয়েছে। বিষের গাছকে যত্ন করে বাড়ালেই তাতে অমৃতের ফল ধরে না, বিষ ছড়ানোর ব্যবস্থাটাই পাকাপোক্ত হয়। বছরের পর বছর ধরে আমরা যে শক্তি দিয়ে স্কুল-কলেজের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলার প্রাণপণ চেষ্টা করেছি, তাতে সমগ্র জাতির মঙ্গল যতটুকু হয়েছে তার চাইতে অমঙ্গলই হয়েছে বেশী, শিক্ষিতদের মধ্যে হিংস্র পশুর মত স্বার্থের কাড়াকাড়ির নিত্যনৈমিত্তিক অভিযান দেখে এ বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়। তবু আমরা বিরাট ব্যয়ে নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় খুলছি, ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে অন্দরের থালা-ঘটি-বাটি বন্ধক দিয়ে বৈঠকখানা সাজাবার মত।

আমরা যে শুধু অস্বস্তিই বোধ করেছি, গলদটা ঠিক কোথায় তা নির্দ্দেশ করতে পারি নি, তার কারণ প্রধানতঃ দুইটি। প্রথমতঃ পর্য্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ শক্তিকে নষ্ট করে দেবার আয়োজন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাটার মধ্যেই রয়েছে :—নইলে অন্ধভাবে বিদেশী ভাষার বিরাট ভূতকে শিশুর ওপর চাপিয়ে দিয়ে আমরা ইংরেজীনবিস হচ্ছি বলে গর্ব্ব অনুভব করতাম না বা একটা বিদেশী ভাষা শেখার প্রাণপণ চেষ্টায় জীবনের এতখানি মূল্যবান সময় নষ্ট করতাম না।

প্রত্যেক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই, সে যে রকমই হোক না কেন, একটা আদর্শ থাকে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এই আদর্শের প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। এর প্রভাব এত বড় যে, সমগ্র জাতির ভাগ্য এরই দ্বারা পরিচালিত হয়, যতক্ষণ না পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর চাপে এর ঘোর কেটে যায়। শিক্ষার এই বিরাট প্রভাব সম্বন্ধে সচেতনতাই বিগত মহাযুদ্ধের পর বিভিন্ন জাতির নূতন ক'রে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা গ'ড়ে তোলার মূলে রয়েছে। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব যে, শিক্ষার্থীকে সর্ব্বতোভাবে নির্ভরশীল ক'রে তোলাই এই ব্যবস্থার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। হাতে-খড়ির পর শিশু যেদিন থেকে বিদ্যালয়ের শীর্ণ পরিসরের মধ্যে প্রবেশ-লাভ করে, সেদিন থেকে তার স্বাধীন

ইচ্ছা ও চিন্তাকে বলিদান করাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আদর্শ ব'লে ধরা হয়। যার কোন স্বাধীনতার বালাই নেই, সজীব ইচ্ছা শক্তি যার মধ্যে নিষ্ক্রিয়, সেই আমাদের দেশে ভাল ছেলে! বিদ্যালয়ে যে ছেলেটি বিনা প্রশ্নে, নির্ব্বিরোধে বইয়ের ছাপার অক্ষরের মন্ত্রগুলি হজম করে, নিজে পরখ না করে বিনা অনুসন্ধানে যে পরের ভাষায় নিজের ঘরের কথা অনর্গল ব'লে যেতে পারে, তাকেই আমরা পুরস্কার লাভের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করি; বিদ্যালয়কে বিন্দুমাত্র আকর্ষণীয় না ক'রে তুললেও যারা কেবল আদেশ ও উপদেশ পালন করার জন্য নিত্য বিদ্যালয়ে আসে তাদেরই দিকে আমরা সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। এই একান্ত মসৃণ বাধ্যতা ও প্রশ্নহীন নির্ভরতা আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থারই জারজ সন্তান। আবাল্যের এই অভ্যাসই আমাদের দাসত্ব ও পরমুখাপেক্ষিতার বনেদকে দৃঢ়তর করেছে।

আমাদের দ্বিতীয় অক্ষমতার কারণ, পাশ্চাত্য সভ্যতার বিদ্যুৎস্ফুরণের প্রতি অদম্য শ্রদ্ধা। একে আমরা যাচাই করে গ্রহণ করি নি, ওটা আমাদের ওপর চেপে বসেছে চাষীর কাদা-মাখা গায়ে ফরসা কোটের মত। পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলে যে শক্তি, তা হচ্ছে অন্যের শক্তিকে নিষ্পেষিত ক'রে নিজের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করার শক্তি। এটা ব্যায়াম ক'রে শক্তি বাড়ানো নয়, নিজেকে উন্নত করা নয়, ওটা অন্যের রক্তে নিজের জোর বাড়ানো। এ সভ্যতাটা তাই যখন পরের দিকে তাকায়, তখন অন্যকে নিষ্পেষিত ক'রে নিজেকে কি ক'রে আরও মহিমান্বিত করে তুলবে এই কথাটাই ভাবে। বাইরের লোকের চোখে এই মহিমাটাই পড়ে, বিরাট প্রাসাদ বিরাট যন্ত্র দেখেই আমরা ভুলি, পর পর দুইটা মহাযুদ্ধের অবতারণা দেখেও আমরা এর গোড়ার দুর্ব্বলতাটুকু ভাল ক'রে দেখতে পাই নি। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাটা এই সভ্যতারই সৃষ্টি, তাই প্রতিযোগিতাকেই এই শিক্ষা পুষ্ট ক'রে তোলে, সহযোগিতাকে নয়।

আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার এই দুইটি গলদই আমাদের দেশের কোন কোন মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন ধ'রে কোন কথাই এত বার বার বলেন নি, যতটা বলেছেন আমাদের জাতীয় জীবনের এই দুষ্ট ব্রণটির কথা।

বিদ্যালয়ের পলাতক ছেলেকে যেদিন বিশ্ববিদ্যালয় তার গণ্ডির মধ্যে সসম্মানে আমন্ত্রণ করেছিল, সেদিন তিনি সেখানে প্রবেশ করেছিলেন আনন্দে বিগলিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসা করতে নয়, দুঃখের কথা জানাতে। হয়তো তাঁর ভরসা ছিল যে, অপাঠ্য পুঁথিতে লেখা তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি-বাগীশরা উপেক্ষা ক'রেও থাকেন, তবু হয়তো তাঁদের সর্ব্ববিশ্বাসের কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদী থেকে উচ্চারিত কথাগুলি একটু আলোড়নের সৃষ্টি করবে। তাঁর সে বিশ্বাস তাঁর অনেক স্বপ্নেরই মত কার্য্যকরী হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল ব্যাধিটাকে সনাক্ত করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন বিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি থেকে শিক্ষাকে জীবনের সুদূর প্রসারী ক্ষেত্রে নিয়ে যেতে, পাশ্চাত্য সভ্যতার আত্মঘাতী আদর্শ থেকে শিক্ষাকে রক্ষা করতে। কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক জগতের বিশ্লেষণের চাঁচা-ছোলা যন্ত্রপাতি নিয়ে কোমর বেঁধে তিনি কাজেতে নামতে পারেন নি, নানা কারণে কবির কল্পদৃষ্টির মধ্য দিয়েই তিনি আমাদের দুরদৃষ্টের কুয়াশা-ঢাকা সত্যের স্বরূপ দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি নির্দ্দেশ দিয়ে গেছেন, সুনির্দ্দিষ্ট পথও দেখিয়ে গেছেন ; কিন্তু পরীক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতিকে তিনি একেবারে উপেক্ষা করতে পারেন নি, যদিচ তিনি বিশ্ববিদ্যালয় বলতে এখানকার যান্ত্রিক সিঁড়িহীন, অপাংক্তেয় কাঠামোটাকে বুঝতেন না, কল্পনা করতেন বাঙলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সজীব সমগ্র শিশু-মূর্ত্তিটিকে। কিন্তু ওই ছিদ্রপথেই শনি তার প্রবেশের পথ ক'রে নিয়েছে, তাঁর গড়া বিশ্বভারতী মামুলী শিক্ষালয়ের উঁচু-নীচু পরীক্ষার ছাঁচে ঢালা একটু স্বতন্ত্র আর একটি বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে, সমগ্র জাতির মধ্যে নূতন একটা প্লাবন আনতে পারে নি, নূতন একটি পথ ও পরীক্ষার নির্দ্দেশের মত এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে।

দগদগে ঘা-টার ওপর নির্ম্মমভাবে ছুরি চালাবার জন্য গান্ধীজীর মত একজন ডাক্তারের প্রয়োজন ছিল। নিরাসক্ত ডাক্তারের মতই রুচিকে উপেক্ষা ক'রে তিনি প্রাণ-রক্ষার দিকে সমগ্র মনোযোগ দিতে পেরেছেন। আমাদের আসল রোগটা

হচ্ছে যে, আমরা কিছু বুঝতে বা করতে পারছি না, কিন্তু আমরা সে সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা না করে বিদ্যালয়ের ঘরগুলিকে চূণকাম করতে লেগে গিয়েছি। এই বিদ্যালয়গুলি চাষাকে চাষের কাজ শেখায় নি, তাঁতীকে তাঁত বুনতে শেখায় নি, যার যা করার ক্ষমতা আছে তা করার সুযোগ এবং শিক্ষা দেয় নি, দেশবাসীকে দেশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়নি, অথচ চাষীর ছেলেকে বাবু বানিয়ে, তাঁতীকে কেরাণী গ'ড়ে দেশের মধ্যে একটা অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করেছে। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা ঐতিহাসিক-ভাবে পরিকল্পিত হয়েছিল কোম্পানীর কাজের জন্য উপযুক্ত কেরাণী গড়তে। সে পরিকল্পনা আজ পরিবর্ত্তিত হয় নি, সুতরাং কেরাণী গড়ার যন্ত্র কেরাণীই গড়ুক, ওটাকে মানুষ গড়ার কাজে লাগানো চেষ্টা করা বৃথা। সমগ্র জাতিকে কেরাণীতে পরিণত করা যায় না জেনেও যে আমরা এই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ব্যাপকতর করবার চেষ্টা করেছি সেটা আমাদেরই অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা পাশ্চাত্যের যে আদর্শে অনুকরণে পরিকল্পিত হয়েছিল, সে ব্যবস্থাকে পাশ্চাত্য শতভাবে পরিবর্ত্তিত করেছে। শিক্ষাকে নিয়ে কতভাবে পরীক্ষা যে ওরা করেছে তার ইয়ত্তা নেই। মরা নদীর মত আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা স্থির, স্থান-কাল-পাত্রভেদে এর কোন পরিবর্ত্তন হয় না, বাস্তবের সঙ্গে একে মানিয়ে নেবার কোন ব্যবস্থা নেই; তাই অব্যবস্থাকে কেন্দ্র ক'রে এত বীভৎসতা জন্ম নিয়েছে।

আমাদের শিশুদের ভার যাঁদের হাতে, তাঁদের কোন শিক্ষা, কোন উপ-যোগিতাই নেই, এঁরাই জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে শিশুর জীবনের শিক্ষার প্রতি প্রথম আগ্রহকে বিভীষিকায় পরিণত করেন; প্রথম থেকেই আমাদের বিদ্যালয়গুলির কাজ হচ্ছে শিশুকে এইটুকু ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া যে, বিদ্যালয়টা জীবনের অন্য সব কিছু থেকে আলাদা, এই সময়টা হাসতে মানা, পৃথিবীর দিকে চাইতে মানা, সহজ হতে মানা। বইয়ের পৃথিবীর ভিতর দিয়ে চলতে হ'লে রামগরুড়ের ছানা হয়ে থাকতে হবে। শিক্ষাকে এমন করে স্বাভাবিক জগৎ থেকে আলাদা করেই আমরা শিশুর বিতৃষ্ণাকে জাগ্রত করি। যার পক্ষে ছুরি থেকে কাঁচিকে আলাদা করা কঠিন নয়,

বিড়াল থেকে কুকুরকে আলাদা করা কঠিন নয়, তার পক্ষে ক থেকে খ-কে আলাদা করা একটা প্রকাণ্ড সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এইজন্য যে, আমরা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পথটাকে একেবারে উল্টে ধরি, তথ্য দেবার আগেই তত্ত্ব কপচাতে শুরু করি। হাত-পা মুড়ে এক জায়গায় বসে থাকা শিশুদের পক্ষে অসহ্য—ওটা তার সজীবতারই লক্ষণ, তাই তারা প্রাণের প্রাবল্যে ছটফট ক'রে একটা কিছু গড়তে বা ভাঙতে চায়। যদি তাদের কিছু শেখাতে হয়, তবে ওই ভাঙা গড়ার খেলার মধ্য দিয়েই শেখাতে হবে, শিক্ষকের কাজ সেই খেলাকে সুপরিচালিত ক'রে অর্থময় কাজে পরিণত করা। আমাদের তাই প্রথম সমস্যা, কি ক'রে কাজকে শিক্ষার বাহন ক'রে তোলা যায়।

দ্বিতীয়ত, আমাদের সমাজের সঙ্গে শিক্ষার কোন যোগ নেই। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাটা ভিক্ষুক তৈরী করার যন্ত্রস্বরূপ—তাই আমরা এত অবজ্ঞার সঙ্গে বিদ্যালয়গুলির দিকে তাকিয়ে থাকি। শিক্ষা আমাদের জীবনের জন্য প্রস্তুত করে না, তাই জীবনের সব চাইতে সুন্দর, সজীব, কর্মক্ষম সময়টুকু বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়েও আমাদের ওর বাইরে এসে কি করব এই ভাবনা নূতন করে ভাবতে বসতে হয়। জগতের চলমান স্রোতের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ঘটাবার এবং সমস্যার সমাধান করবার মত শক্তি অর্জ্জন করার কোন ব্যবস্থাই বিদ্যালয়ের মধ্যে নেই বলেই এই অবস্থা ঘটে থাকে। সুতরাং শিক্ষাকে নূতন করে গড়তে হলে সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রাচীরটা কি করে ভেঙ্গে ফেলা যায়, সে কথা আমাদের ভাবতে হবে। বিদ্যালয়গুলি যে সমাজের বোঝা নয়, সমাজের ঐশ্বর্য্য বাড়াবার কেন্দ্র, সেটা প্রমাণিত করতে হবে।

বইয়ের কতগুলি কথা মুখস্থ করাই আমাদের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত; ছাত্র-ছাত্রী জীবনে সেগুলি প্রয়োগ করে কি না, তা দেখার দায়িত্ব বিদ্যালয়ের নেই। যে কোন রকমে পরীক্ষা-পাসের ছাপটা জুটলেই সবাই খুশি। এই ব্যবস্থাই আমাদের বিদ্যালয়ে ভাল ভাল বুলি মুখস্থ করতে এবং দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিতে শিখিয়েছে। আমরা 'সত্য

কথা বলিবে' 'অন্যের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে' ইত্যাদি মুখস্থ করি, কিন্তু সত্য কথা বলি না বা কারও সঙ্গেই সদ্ব্যবহার করি না। জীবনের মধ্যে খানিকটা পুঁথিগত জ্ঞান আত্মসাৎ করাই আমাদের মতে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত, তা ছাড়া জীবনের সমগ্র ব্যাপক অংশটিকেই আমরা অবজ্ঞার সঙ্গে হরিজনের দলে ফেলে রাখি; সুতরাং কি করে শিক্ষাকে জীবনে প্রয়োগ করার কাজে লাগানো যায়, এই আমাদের আর একটি সমস্যা। এই শিক্ষা কি করে আমাদের সমাজের অর্থনৈতিক সংস্কারে সহায়ক হবে, সে কথা আমাদের ভাবা প্রয়োজন।

শিক্ষাকে একটা নূতন রূপ দেবার আশু প্রয়োজন দেশের অনেকেই অনুভব করছেন। ওয়ার্ধায় হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘের উদ্যোগে গান্ধীজীর অনুপ্রেরণায় একটি শিক্ষা-ব্যবস্থার খসড়া তৈরী করা হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রদেশে একে ব্যাপকভাবে রূপ দেবার চেষ্টাও চলছে। কিন্তু বাঙলা দেশে এখনও পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনাই হয় নি। এই ব্যবস্থার ভিত্তি মোটামুটি চারটি প্রস্তাবের ওপর:— (১) সাত বছরের প্রাথমিক, সার্ব্বজনীন, অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, (২) শিক্ষার বাহন হবে কাজ, এবং সমাজ ও আবেষ্টনীর সঙ্গে শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করতে হবে, (৩) শিক্ষাকে আর্থিকভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ করতে হবে, (৪) সত্য ও অহিংসার ওপর শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করতে হবে।

আমরা শান্তি, পবিত্রতা, সহযোগিতা, ন্যায়নিষ্ঠা প্রভৃতি অনেক কিছু ভাল ভাল জিনিসের জন্য চীৎকার করছি, কিন্তু ভবিষ্যতে যারা ভারতের নাগরিক হবে, তাদের তেমন ভাবে গড়ে তুলছি কি? শূন্য ভাণ্ডারের শিখণ্ডীকে সামনে দাঁড় করিয়ে আমাদের শাসকরা বহুদিন আমাদের শিক্ষা-সম্প্রসারণকে অচল করে রেখেছেন। ওয়ার্ধা-ব্যবস্থা দাবী করছে, শিক্ষার এসব প্রাথমিক সমস্যা জয় করা যায়। তবু যে কেন আমরা দীর্ঘ সাত বৎসরের মধ্যে এটাকে পরীক্ষা করে দেখারও সময় পাইনি, সেটাই আশ্চর্য্য।

দুই

ভারতবর্ষ গ্রাম-কেন্দ্রিক। এ দেশের শতকরা নব্বুইটি লোক গ্রামেই বাস করে। আমাদের সমস্যাগুলিও তাই প্রধানত গ্রামেরই সমস্যা। এ কথাটা সহজ হলেও কার্যত আমরা এই কথাটা প্রায়ই ভুলে যাই। আমাদের শাসকেরা আমাদের দেশে যে সভ্যতার আমদানি করেছেন তা নগর-কেন্দ্রিক। ওটা সহজ ও স্বাভাবিক-ভাবে আমাদের দেশে গ'ড়ে ওঠে নি, ওকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে অপরিমেয় দ্রুতগতিতে জগৎ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে এগিয়ে গেছে, তার সঙ্গে ভারতবর্ষ তাল রেখে চলতে পারে নি। গত দুইশত বছরে জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডার অভূতপূর্ব্বরূপে প্রসারিত হয়েছে—ভারত সে জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয় নি, নূতন জীবনের শক্তি তার নাড়ীতে নাড়ীতে সঞ্চারিত হয় নি, কিন্তু সেই সভ্যতার বোঝা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইখানেই আমাদের চরম দুর্ভাগ্যের জন্ম। আমাদের কলের কাপড় যথেষ্ট তৈরী করার বা পরার সামর্থ্য নেই, অথচ নিজেদের তাঁতশিল্প আমরা ভুলেছি; আমাদের ট্র্যাক্টরও নেই, বৈজ্ঞানিক সারও নেই, অথচ হাল-লাঙ্গল চালানোও আমরা ভুলতে বসেছি। নূতন নূতন আধুনিক বিদ্যালয় গ্রামে গ্রামে গড়ার সামর্থ্যও আমাদের নেই, অথচ চতুষ্পাঠী, পাঠশালা, মক্তব, কথকতা, যাত্রা এগুলিকেও আমরা মেরে ফেলেছি। এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা প্রাগ্ঐতিহাসিক যুগে ফিরে যেতে পারি না একথা যেমন সত্যি, তেমনই ব্যাঙ থেকে ফুলে ষাঁড় হয়ে যেতে পারি না সে কথাও সত্যি। মুষ্টিমেয় জনকয়েক শিক্ষিত হ'লেই জাতির ক্রমবিকাশ সাধিত হয় না; তার জন্য ব্যাপক শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

তা ছাড়া আর একটা কথা আছে। প্রথম যখন একটা সভ্যতা গড়ে ওঠে তখন তা এগিয়ে চলে ভিতরকার প্রাণশক্তির আবেগে—বিচারের স্থান তাতে থাকে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানসর্ব্বস্ব যান্ত্রিক সভ্যতা ধূমকেতুর মত বিপুল বেগে পৃথিবীর বুকে ছুটে বেড়িয়েছে। এই বিপুল শক্তি জগৎকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। আজ যখন পৃথিবীর ক্ষতবিক্ষত বুকে এর বেগ স্তিমিত হয়ে এসেছে তখন আমরা

বিরাট বহ্নিদাহের প্রচণ্ড ঔজ্জ্বল্যের আড়ালে লুকানো বিপুল কালিমাকে দেখতে পাচ্ছি, তখন একে বিচার করার সময় এসেছে—এর সবটুকু যে গ্রহণযোগ্য নয়, সে কথাটা স্পষ্ট করে বোঝবার ও বোঝাবার সময় হয়েছে।

এই দুইটি মূল উপলব্ধির ওপর ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনার ভিত্তি। এই পরিকল্পনা আজও পরীক্ষামূলক অবস্থার মধ্যে রয়েছে, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এর রূপায়ণ ভিন্ন হবে, একথা পরিকল্পনাকারীরা স্বীকার করেন। বস্তুত এই স্বীকৃতিই পরিকল্পনার জীবনীশক্তির সুস্পষ্ট লক্ষণ। কিন্তু এর মূল সূত্রগুলি সুস্পষ্ট এবং সহজবোধ্য। আমরা সেগুলি সম্পর্কেই এই প্রবন্ধে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

গ্রামগুলি আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, এ কথা কেউ অস্বীকার করেন না; অথচ এগুলি যে আজ চরম দুর্গতির মধ্যে সম্পূর্ণ বিলুপ্তির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, সে কথাটাও উপলব্ধি করা কঠিন নয়। এ পরিণতি যে এর বর্ত্তমান সভ্যতাকে গ্রহণ করতে না পারার জন্যই ঘটেছে সে কথাও বলা কঠিন, কারণ কোনদিন এই গ্রামগুলি স্বয়ং-সম্পূর্ণ ছিল; এরা তখন নিজেদের অভাব মোচন তো করেছেই, বরং পরের অন্নবস্ত্রের অভাবও ঘুচিয়েছে। এই বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক সভ্যতার দিনেও যে সেই কুটীর শিল্পের প্রয়োজন আমাদের দেশে একেবারে শেষ হয়ে যায় নি, সংহত সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে চালালে আজও যে কুটীর শিল্প বেঁচে থাকতে পারে, তার প্রমাণ আজ ভারতবর্ষে একেবারে নেই এমন নয়। কিন্তু নিশ্চেষ্ট নিঃসহায় ভাবে এরা নিজেদের সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক মৃত্যুর জন্য অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে নীরব হয়। আমরাও বাইরে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকি। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা পরম দুর্ভাগ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু মৃত্যুর হিমশীতল আলিঙ্গনের মধ্যে দাঁড়িয়ে এ নির্ম্মম দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে ভাবা ছাড়া আর কিছু করার আছে কিনা সেটাই চিন্তনীয় বিষয়। বৈজ্ঞানিক কার্য্যকারণবাদ সম্বন্ধে জ্ঞান নেই বলে আমরা অজ্ঞ গ্রামবাসীদের অবজ্ঞা করি। এদের কুসংস্কার, জড়তা, অদৃষ্টবাদকে ধিক্কার দিই; কিন্তু ওই কুসংস্কার ও জড়তাকে দূর করার চেষ্টা আমরা করি না। আমরা নিজেদের

দিকে চেয়ে দেখি না যে, আমরা নিজেরা কতখানি জড়, মূঢ় ও অদৃষ্টবাদী বলে আমাদের মঙ্গলের সমাধি আমাদের চোখের সামনে রচিত হচ্ছে জেনেও এগিয়ে যেতে পারি না। বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আছে বলে আমরা গর্ব্ব করে থাকি, অথচ এই ধ্বংসোমুখ গ্রামের সঙ্গেই যে আমাদের সকল সৌভাগ্যের পরিসমাপ্তি ঘটছে, তা কয়জনে বুঝি বলা কঠিন। অবশ্য বোঝা ও করার মধ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষা-মারফৎ আমরা যে সীমারেখা টানতে শিখেছি, তাতে বুঝেও কাজ না করা একটা কিছু আশ্চর্য্য নয়।

এ সম্পর্কে আমাদের করবার মত কাজ আছে, গ্রামগুলিকে বাঁচিয়ে তুলে আমাদের নিজেদের মৃত্যুর মুখ থেকে আজও বাঁচানো সম্ভব—এই কথাই বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা জোর দিয়ে বলবার চেষ্টা করেছে। 'গ্রামে ফিরে যাও, গ্রামের উন্নতি কর' এই কথাগুলো আমরা আপ্তভাবে বহুদিন ধ'রে শুনে আসছি। মাঝে মাঝে হুজুগের মুখে গ্রাম-উন্নয়নের, জঙ্গল সাফ করার ধুম প'ড়ে যায়—ঝোঁক যখন কেটে যায় শহরের ছেলেরা শহরে ফিরে আসেন, স্তিমিত গ্রামগুলি আবার ঝিমিয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে দু-চার দিন আমরা নৈশবিদ্যালয় খুলে দু-চারপাতা লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করি, গ্রামের লোকের সাড়া না পেয়ে দিন কয়েক পরেই সেগুলি বন্ধ হয়ে যায়—গ্রামের লোকেরা হজম-না-করা বিদ্যাকে নিঃশেষে ভুলে নিশ্চিন্ত হয়, চণ্ডীমণ্ডপে গুরুমশাইয়ের অবিরাম বেত্রবর্ষণের মুখে অসহায় বালক-বালিকার কান্না অসহায় গ্রামের বোবাকান্নার প্রতিধ্বনি তোলে। জাতীয় জীবনের দীর্ঘকালের জড়তাকে জয় করতে হ'লে যে গোড়া থেকে শুরু করা দরকার, সে কথা ভুলে যাই ব'লেই আমাদের চেষ্টা এমনই ক'রে নিষ্ফল হয়।

আমাদের সর্ব্বপ্রকার অধঃপতনের মূলে রয়েছে আমাদের জড়তা, অথচ আমরা আমাদের স্কুল-কলেজের মধ্য দিয়ে এই জড়তাকেই আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরের মধ্যে অঙ্কুরিত করি। যদি স্বাভাবিক প্রাণশক্তির প্রভাবে এরা চঞ্চল হয়ে ওঠে, তবে শৃঙ্খলার নামে আমরা অসংকোচে সেই কর্ম-প্রচেষ্টাকে নষ্ট ক'রে দিই।

পারস্পরিক অসহযোগিতাই আমাদের দুর্ব্বলতা, অথচ আমরা বাল্যকাল থেকে শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতাকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকি। ওয়ার্ধা-পরিকল্পনার লক্ষ্য —কাজের লোক গ'ড়ে তোলা এবং বাস্তব জগতে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে গেলে যে সহযোগিতার প্রয়োজন, এই সত্যটিকে আমাদের মনে এবং অভ্যাসে দৃঢ়বদ্ধ ক'রে দেওয়া। এজন্য অযোগ্য পাঠ্য-পুস্তকের অযথা-ভারমুক্ত হয়ে কাজকে কেন্দ্র ক'রে এই শিক্ষা গ'ড়ে উঠবে—এই নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। এইটুকু শুনেই আমরা আঁৎকে উঠি। বহুদিন ধ'রে কাজ না ক'রে কেবল কথার তোড়ে মান বাঁচিয়ে চলার যে সহজ পথটি আমরা আবিষ্কার করেছিলাম, তার গোড়াতেই আঘাত পড়তে দেখে আমাদের বিচলিত হবারই কথা। বুনিয়াদী শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি করা হয়ে থাকে যে, এই পদ্ধতি আমাদের জাতটাকে তাঁতী, ছুতোর, মিস্ত্রীতে পরিণত ক'রে ফেলবে, উচ্চতর জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্থান এতে নাই। জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই ধারণা হাস্যকর। কাজের মধ্যে দিয়েই আমরা কাজ করার সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, সে সমস্যার সমাধান থেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্ম। পৃথিবীর যত বয়স বেড়েছে, আমাদের কাজ তত বহুমুখী হয়েছে, ততই আমাদের সম্মুখে নানা সমস্যা এসে দাঁড়িয়েছে, আমরাও ততই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের সমস্যাকে দেখবার সুযোগ পেয়েছি। জ্ঞান-বিজ্ঞান আকাশ থেকে ঝ'রে পড়ে নি, আমাদের ও পরিবেশের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই এদের জন্ম। বুনিয়াদী শিক্ষা এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সমাধানের মধ্য দিয়েই পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা দিতে চায়, না-বোঝা-না-জানা কাল্পনিক সমস্যার কাল্পনিক সমাধানকে মুখস্থ করিয়ে নয়। আমরা এ কথা বলি না যে, বুনিয়াদী শিক্ষা-সমিতি আজ দেশের সামনে যে কর্ম্মসূচী দাঁড় করিয়েছেন, সেটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, ওতে আর নূতন কিছু যোগ করার নেই। বরং সমিতি বার বারই স্বীকার করেছেন যে স্থান-কাল-পাত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কর্মপন্থাকে নূতন নূতন রূপ দেবার প্রয়োজন চিরদিনই হবে। আমরা, যারা আজ দর্শন কপচাচ্ছি বা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দোহাই পাড়ছি তারা, ভুলে গেছি যে, প্রাচ্যের দর্শন বা পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান কোনটাই শুধু মাত্র

ভাববিলাস নয়—সুনির্দ্দিষ্ট জীবন-ধারা। আমাদের ব্যাধি-জর্জ্জরিত, উপবাস-ক্লিষ্ট, দুর্ভিক্ষ মহামারী-বিধ্বস্ত গ্রামের প্রাথমিক সমস্যা—বেঁচে থাকার সমস্যা, অন্নবস্ত্রের সমস্যা। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব নেই তবু আমরা রিক্ত, আমাদের মাঠে মাঠে সোনার ফসল তবু আমরা অভুক্ত; যারা যোগায় সারা দেশের অন্ন তারাই অন্নহীন, গৃহহীন; আমাদের সীমাহীন লোকবল তবু আমাদের পরম দুর্ভাগ্যের কথা দুজনে মিলে ভাবতে পারি না, পরম ক্লান্তিতে আমরা এমনই স্তিমিত হয়ে পড়েছি যে, আমরা ব্যথায় চীৎকারটুকু পর্যান্ত করতে অসমর্থ। এইটুকু শিক্ষা, পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার সামান্য একটুখানি নৈপুণ্য, সামান্য পশুর আত্মরক্ষা করার যে স্বাভাবিক প্রকৃতিদত্ত জ্ঞানটুকু—সেটুকু জ্ঞান যাদের নেই তাদের কাছে অণুবীক্ষণের স্বপ্ন, ইউরোপ-আমেরিকার সভ্যতার খবর নিয়ে যাওয়া শুধু হাস্যকর নয়—ওদের প্রতি নির্লজ্জ অপমান, নিষ্ঠুর উপহাস।

তিন

কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষা যে কেবল ওই একান্ত প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শিক্ষার আয়োজন ক'রেই ক্ষান্ত হতে চায়, সে কথা সত্য নয়। বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা-কারীরা বিশ্বাস করেন যে, শিক্ষাকে যদি গোড়া থেকেই সংস্কৃত করা যায়, তবে জ্ঞানবিজ্ঞানের সবটুকু প্রয়োজনীয় সংবাদই গ্রামের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভবপর। সবাইকে তাঁতী, ছুতোর, চাষী ক'রে গ'ড়ে তোলাই বুনিয়াদী শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য নয়। শিক্ষালয় থেকে স্বাভাবিক ভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে সমাজের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে, শিক্ষালয় যাতে সমাজেরই একটা অবিচ্ছিন্ন অঙ্গরূপে গ'ড়ে উঠতে পারে, এবং সমাজকে সর্ব্বতোভাবে সংস্কৃত করতে পারে—এইটেই এই শিক্ষা-পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য। শিশুর মধ্যে যাতে প্রথম থেকেই স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বিতার গোড়াপত্তন হয়, স্বেচ্ছাচার থেকে স্বাধীনতাকে যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা আলাদা ক'রে দেখতে শেখে, শিশুর কাজ করার সুস্থ প্রবৃত্তিকে যাতে তার মানসিক সর্বপ্রকার বিকাশের কাজে লাগিয়ে দেওয়া যায়, এগুলিই এই পদ্ধতির মূল সম্পাদ্য।

বুনিয়াদী শিক্ষার পরিসর সাত বৎসর। আমরা যারা ইংরেজী-শিক্ষার মানদণ্ডে সব-কিছু মাপতে অভ্যস্ত তাদের জানানো হয়েছে যে, এই সাত বছরে ইংরেজী ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের চেয়ে বেশি বই কম জ্ঞান লাভ করবে না। আমাদের বর্ত্তমান ব্যবস্থায় এই জ্ঞানটুকু আমরা প্রায় দশ বৎসরে লাভ ক'রে থাকি, তাও পরীক্ষার পর মুহূর্ত্তে মুখস্থ-করা বুলিগুলো প্রায় নিঃশেষে ভুলে যাই। দশ বছরের শিক্ষা সাত বছরে কি ক'রে দেওয়া সম্ভব এ কথা যাঁরা ভাবেন, তাঁদের স্কুল-কলেজের পাঠ্যতালিকা ও বিকৃত পরীক্ষা-ব্যবস্থার দিকে একটু তাকিয়ে দেখতে অনুরোধ করি। শিক্ষাটা যে শিশুর জন্য, তাকে আগ্রহান্বিত ও সক্রিয় ক'রে তোলার যে কোন প্রয়োজন আছে, সে কথাটা আমাদের মনেই থাকে না। উনবিংশ শতাব্দীর বহুদিন পরিত্যক্ত প্রথায় শিক্ষক আজও আমাদের শ্রেণীগুলিতে বাক্যের স্রোত ছড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হন। বক্তৃতাগুলি করা হয় ক্লাসে যারা সব চাইতে বোকা তাদের লক্ষ্য করে; যারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান তাদের যে বিরক্তি জন্মায় বা সময়ের অপচয় হয় সেদিকে আমরা লক্ষ্য রাখি না। পড়া তাড়াতাড়ি শিখলেও এগিয়ে যাবার উপায় নেই, তাই সারা বৎসর হেলায় কাটিয়ে পরীক্ষার আগে ছাত্র-ছাত্রীরা স্বাস্থ্য নষ্ট ক'রে মুখস্থ করতে বসে। সময়ের অসদ্ব্যবহার দেখে আমাদের ক্রোধ এবং বিরক্তি মাঝে মাঝে উদ্যত হয়ে ওঠে, কিন্তু আমরা লক্ষ্য ক'রে দেখি না, পরীক্ষার জুয়াখেলার জন্য মোটামুটি পাঠ্যবস্তুটুকুকে কোনমতে মুখস্থ করতে অধিকাংশ ছেলে-মেয়েরই দু-তিন মাসের বেশি সময় লাগে না। আবার সারা বছর ফাঁকি দিয়ে যারা পরীক্ষার বেড়াগুলি টপ্ টপ ক'রে ডিঙিয়ে যায়, তাদের প্রতি আমাদের কোন অভিযোগ তো থাকেই না বরং আমরা অসংকোচে তাদের কৃতিত্বের প্রশংসা করি। বোঝা-না-বোঝায় কিছু এসে যায় না, পরীক্ষার বোঝাটা যে অনায়াসে বইতে পারে, তারই পিঠে আমরা কৃতিত্বের ছাপটা এঁটে দিই। সুতরাং শিক্ষার্থীর আকর্ষণ জ্ঞানের দিকে থাকে না, থাকে পরীক্ষার দিকে এবং এই বিকৃত আকর্ষণকে কেন্দ্র ক'রেই শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে সর্ব্বপ্রকারের বিকৃতি ও নির্লজ্জ

কদর্য্যতা। আবার এই শিক্ষার ভার যাঁদের হাতে, তাঁদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষা বা শিশুর সঙ্গে যোগই নেই—যোগ টাকার সঙ্গে। সেই টাকাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এত অল্প যে তাতে নামমাত্র কর্ত্তব্যটুকুও পালন করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, তবু ঠিক থাকতে হয় আর কিছু করার যোগ্যতা নেই ব'লেই। এইজন্যই আমাদের শিক্ষা এগিয়ে চলে মন্দাক্রান্তা তালে, আর সে শিক্ষাটুকু আমাদের জীবনে কোন মহৎ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না—বিদ্যালয়ের গণ্ডীর বাইরে পা বাড়িয়েই আমরা বিদ্যালয়ের কৃত্রিম শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেতে পারি।

শিশুর সঙ্গে নিবিড় যোগ তার পরিবেশের। প্রকৃতির এই বিরাট পুঁথি-খানিতে জ্ঞানের কোন বিষয়-বস্তুরই অভাব নেই—এর প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা পাঠ করার চেষ্টাই জ্ঞানের অনির্ব্বাণ সাধনা। একে আমরা পড়তে জানি না বলেই আমাদের নকল পুঁথি লিখতে বসতে হয়। শিশুর যে সব জ্ঞান দরকার তার যথেষ্ট উপকরণ তার চারপাশেই রয়েছে, শুধু শিশুর প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়কে সে বিষয়ে সজাগ করে দেওয়া দরকার। এই পরিবেশের সঙ্গে শিশুর যোগ নিবিড়, শুধু যদি একবার তার আগ্রহকে জাগ্রত ক'রে দেওয়া যায়, তবে শিক্ষা এগিয়ে চলে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে—এইখানেই বুনিয়াদী পরিকল্পনার সময়সংক্ষেপের সংকেত। স্বাস্থ্যরক্ষা শেখার জন্য পুঁথি ঘাঁটার প্রয়োজন অল্প—চারিদিকেই ব্যাধির যে তাণ্ডবনৃত্য চলছে, তা থেকে মুক্ত থাকাও করার চেষ্টার মধ্য দিয়েই স্বাস্থ্য রক্ষা শেখানো যায়; গ্রামখানিই শিশুর ছোট্ট পৃথিবী, এর মধ্যে ভূগোল শেখার সমস্ত প্রাথমিক উপকরণ রয়েছে। প্রকৃতি কোথাও কৃপণ নয়, সেই অজস্রতার মধ্যেই বিজ্ঞানের মণিকোঠার চাবি। এই পরিবেশের সঙ্গে নিয়ত সংযোগে যে শিক্ষা তার মধ্যে কৃত্রিমতা নেই, এটা মুখস্থ ক'রে শেখা নয়, কাজ ক'রে শেখা, এই রকম শেখার ব্যবস্থা করাই বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য।

আমাদের ক্ষতবিক্ষত আর্থিক ব্যবস্থাকে ভিত্তি ক'রে শিক্ষাটা নিরর্থক বোঝার মত আমাদের কাছে একটা বিরক্তির বস্তুই হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভিক্ষুক তৈরী করার ভিক্ষুক-যন্ত্রটার দিকে আমরা অবজ্ঞার সঙ্গেই চেয়ে থাকি। বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা

দাবি করে যে, শিক্ষার এই ভিক্ষাবৃত্তি নিরোধ করা দরকার এবং সম্ভবপর। শিক্ষাকে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় ব'লেই আমাদের দেশে শিক্ষাটা পরের হুকুমমত চলে। গান্ধীজী এক জায়গায় অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন যে, শিক্ষাকে যদি আর্থিকভাবে স্বয়ং-সম্পূর্ণ ক'রে তোলা না যায়, তবে বুঝতে হবে মাষ্টারগুলি বোকা, অকর্ম্মণ্য; আর শিক্ষা-ব্যবস্থাটা একটা ধাপ্পাবাজী মাত্র। প্রথমটা এই কথাগুলি প'ড়ে মনে একটা ধাক্কা লাগে। পৃথিবীর সব দেশে যখন শিক্ষার জন্য টাকা ছড়ানোর অন্ত নেই, তখন এই বেসুরো কথাগুলি নিতান্তই অবাস্তব বলে মনে হয়। আমাদের এখনকার বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের কর্ম্মক্ষমতাকে শুধু উপেক্ষা করি না, তার প্রকাশকে জোর ক'রে রুদ্ধ করে দিই। কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষাদানের প্রথা বহুদেশ গ্রহণ করেছে, সুতরাং ওয়ার্ধা পরিকল্পনার প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ নূতন নয়। আমাদের রাজনৈতিক অবস্থাতে এই প্রস্তাবের একটা বিশেষ মূল্য আছে। অন্য স্বাধীন দেশে শিশুকে সকল আবিলতা থেকে বাঁচিয়ে ভবিষ্যতের উপযুক্ত নাগরিকরূপে গ'ড়ে তোলার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের শাসকেরা কার্য্যত সে দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি। সুতরাং এ যাদের জীবনমরণের সমস্যা, তাদেরই তাদের সাধ্যানুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে।

কিন্তু এই রাজনৈতিক মূল্যই এই নির্দ্দেশের একমাত্র কারণ নয়। প্রত্যেকটি শিশু যদি জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির কাজে নিজেকে নিযুক্ত করে, তবে সাত বছরে সে তাঁর শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জ্জন করতে সক্ষম হবে এবং এই উপার্জ্জন ক্ষমতাই তার উপযুক্ততার মান বলে বিবেচিত হবে। গত কয়েক বছরের পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রথম দুই বছর শিশু যথেষ্ট উপার্জ্জন করতে না পারলেও তারপর শিশু ধীরে ধীরে তার শিক্ষাব্যয় বহন করার উপযুক্ত উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। আমরা অবশ্যই মনে করি যে, আর্থিক আত্মনির্ভরতার মানটিকে অত্যন্ত নীচু করে রাখা হয়েছে। পঁচিশ টাকা মাইনেতে একজন শিক্ষকের জীবনের নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয়টুকুও নির্ব্বাহ করা চলে না। আমাদের

মনে হয়, খণ্ডভাবে শিক্ষাকে দেখার জন্যই ওয়ার্ধা প্রস্তাবে এই ত্রুটিটুকু রয়ে গেছে। শিশুর শিক্ষা যতই এগিয়ে চলে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করার ক্ষমতাও তার ততই বেড়ে চলে। সাত বছর বুনিয়াদী শিক্ষার পর বিবিধ প্রকারের বিশেষ উচ্চশিক্ষা যখন শিশু লাভ করবে, তখন তার উপার্জ্জনক্ষমতা আরও অনেক বেশী বেড়ে যাবে এবং তার ফলে শিক্ষা-ব্যবস্থার আর্থিক ভিত্তিটা আরও দৃঢ় হবে ব'লে আমাদের বিশ্বাস। উচ্চশিক্ষা আজকাল ব্যয় বাড়াতেই সাহায্য করে থাকে, এই জন্য উচ্চশিক্ষার কথাটা বোধ হয় শিক্ষার রূপান্তরে প্রথম স্থান পায় নি। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে, কর্ম্মকেন্দ্রিক বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চশিক্ষারও পূর্ণ রূপান্তর ঘটবে—তখন উচ্চশিক্ষাও যাঁরা সাধন করবেন তাঁরাই জাতীয় সম্পদ বাড়িয়ে তোলার প্রধান সহায়ক হবেন এবং এই উচ্চশিক্ষার শ্রেণীগুলিই বিদ্যালয়ের আর্থিক বলকে দৃঢ় করবে। শিক্ষাব্যবস্থার রূপান্তরের এই পরিকল্পনার বিশেষ আলোচনা করার স্থান এই প্রবন্ধে নেই, আমরা অন্য প্রবন্ধে সে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

শিক্ষাকে আর্থিকভাবে আত্মনির্ভর করে তোলার প্রস্তাবকে আমরা গান্ধী-পরিকল্পনার নূতন কথা বলে মনে ক'রে থাকি। বিদ্যালয়গুলি জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির কেন্দ্র হবে—এ কথাটা অসম্ভবও নয়, নূতনও নয়, আমাদের দেশের অদ্ভুত আর্থিক ব্যবস্থার জন্যই প্রস্তাবটা এত নূতন ঠেকে। অন্যান্য দেশের মনীষীদের কথা বাদ দিলেও আমাদের দেশেই রবীন্দ্রনাথ ১৯২১ খৃঃ অব্দে তাঁর "The Centre of Indian Culture" শীর্ষক প্রবন্ধে শিক্ষার আর্থিক স্বাবলম্বনের কথা খুব জোর দিয়ে বলে গেছেন। কিন্তু আপাতসহজ মনে হ'লেও শিক্ষাকে সত্য ও অহিংসার ভিত্তির ওপর গড়ে তোলার প্রস্তাবই ওয়ার্ধা-পরিকল্পনার মৌলিক এবং সবচেয়ে বৈপ্লবিক প্রস্তাব। শিক্ষার ক্ষেত্রে সত্য বলতে আমরা কোন মতবাদ, তত্ত্ব বা তথ্যকে বুঝি না, বুঝি একটি মনোবৃত্তিকে। অন্ধ-ভক্তি বিশ্বাস বা দ্বেষের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে যুক্তি দ্বারা যে কোন সমস্যার সমাধানের চেষ্টাই সত্য; প্রতিযোগিতার পরিবর্ত্তে সহযোগিতাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টাই অহিংসা। সত্য ও শান্তির আদর্শকে জোর গলায়

প্রচার করলেও জাতীয় ও দলগত স্বার্থকেই আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছি। বিগত মহাযুদ্ধের পর শিক্ষাব্যবস্থাকে তথাকথিত প্রগতিশীল জাতিরা যে রূপ দিয়েছিল, তা উগ্রজাতীয়তার পরিপোষক। এই শিক্ষা-ব্যবস্থার ফলে জাতীয়তার প্রসার হয়েছে সত্যি, কিন্তু মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে নি। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের অবতারণা এবং এর ভয়াবহতা এই শিক্ষাব্যবস্থারই পরিণাম। শিক্ষা যে মানুষের বিকাশকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে তার পরীক্ষা হয়ে গেছে—গান্ধীজীর প্রস্তাব নূতনতর এবং কঠিনতর পরীক্ষার দাবি করছে। দেশাত্মবোধ, জাতীয় শৃঙ্খলা এবং কর্ম্মনিষ্ঠা যদি শিক্ষা দ্বারা জাগ্রত করা যায়, তবে উদার মনুষ্যত্বও শিক্ষার মধ্য দিয়েই জাগ্রত করা সম্ভব, এইটেই ওয়ার্ধা-পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় কথা। আজ যুদ্ধক্লান্ত জগৎ শান্তি চাইছে। আমরা মুখে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য চীৎকার করছি, কাজে নূতন যুদ্ধের বীজ বপন ক'রে চলেছি। ওয়ার্ধা-পরিকল্পনা নূতন জাতি গড়তে চায়, নূতনতর সভ্যতার গোড়াপত্তন করতে চায়। এর সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে নানা সন্দেহ আমরা পোষণ করছি, কিন্তু এই নূতন পরীক্ষাকে কার্য্যকরী করার চেষ্টা করছি না। কাজের গোড়ায় তর্ক তুলে সময় নষ্ট করা ক্ষতিকর। এই পরীক্ষা নূতন, সুতরাং কোন নজির তোলার চেষ্টা করা বৃথা, কাজের মধ্য দিয়েই এর পরিচয় মিলবে।

চার

এবার বাংলা দেশের বাস্তব ক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষার আলোচনা করার চেষ্টা করা যাক্‌ মৃত্যুর কোন গুণ্ঠন নেই, দুর্ভিক্ষ মহামারী কোন সুসভ্য ভদ্রতার মুখোশ এঁটে বেড়ায় না, তাই তাদের নগ্ন রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি। ঘুণ-ধরা গ্রাম্য সমাজের খুঁটির ওপর আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরাট কড়ি-বরগা চাপিয়ে নূতন সভ্যতার সৌধ গড়ার চেষ্টায় মত্ত ছিলুম—আমাদের উন্মত্ত প্রচেষ্টার ফাঁকে অনাদৃত খুঁটিগুলি ধরাশয্যা গ্রহণ করেছে। শোনা যায়, শ্মশানে বৈরাগ্য জন্মানো স্বাভাবিক; কিন্তু বাংলা দেশের শ্মশানে দাঁড়িয়েও যে আমরা আজ শেয়াল-কুকুরের মত স্বার্থ নিয়ে কাড়াকাড়ি ও

ঝগড়া করছি তাতে সন্দেহ হয় যে, মনুষ্যত্বের যেটুকু অবশিষ্ট থাকলে শ্মশানে দাঁড়িয়ে বৈরাগ্যের উদয় হতে পারে, সেটুকুও হয়তো আমরা হারিয়েছি।

বাংলা দেশের গ্রামগুলি যে শ্মশানে পরিণত হয়েছে, দুর্ভাগ্য-দুর্ব্বিপাকের নির্ম্মম আঘাতে আমাদের মনুষ্যত্ব যে আজ ভূলুণ্ঠিত, এ সত্যে সন্দেহ করার মত আবরণটুকুও আজ আর কোথাও নেই। দুর্ভিক্ষের লেলিহান জিহ্বার যে ক্ষীণ ছায়াটুকু মাত্র আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরীর ওপর পড়তে দেখেছি, তাতে অসহায় গ্রামগুলির ওপর তার রুদ্র মূর্ত্তির কল্পনা করাও কঠিন। এই সর্ব্বব্যাপী দুর্ভিক্ষের সঙ্গে এসে জুটেছে মহামারীর দুর্নিবার বীভৎসতা। যে অবজ্ঞাত গ্রাম্য সমাজের ভিত্তির ওপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি, সে ভিত্তি ফেঁটে চৌচির হয়ে ধ'সে পড়ছে চারদিকে। ইংরেজী কেতায় কমিশন বসিয়ে এই চরম দুর্গতির জন্য দায়ী কে, তার বিচার করার, কিংবা এই দুর্ভাগ্যের গভীরতা কতখানি, তার পরিমাপ করার সময় নেই আমাদের। আমাদের সামনে আমাদের সমস্যাটি সুস্পষ্ট—হয় আমাদের দুর্ব্বল বাহু নিয়েই আমাদের মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে হবে, অথবা নিঃশব্দে মৃত্যুকেই বরণ ক'রে নিতে হবে।

আমাদের এই সমস্যার দুটি দিক আছে। হঠাৎ যখন শিরা কেটে রক্তস্রোত বইতে থাকে, তখন প্রথম প্রয়োজন সেই রক্তস্রোত বন্ধ করা, তারপর রোগীকে ঔষধ-পথ্য দিয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ ক'রে তুলতে হয়। আমাদের গ্রামে গ্রামে আজ সুস্থ সবল মানুষ নেই, কাটবার লোকের অভাবে মাঠের ধান মাঠেই নষ্ট হচ্ছে, দুর্ব্বল শরীরের জীর্ণ দুর্গপ্রাকার ভেদ ক'রে রোগের বীজাণু সহজেই মারাত্মক হয়ে উঠছে। আমাদের এখনকার প্রাথমিক কর্ত্তব্য, ধার-কর্জ্জ ক'রে হোক, অন্যের পায়ে ধ'রে সেধে হোক, একটা প্রাথমিক ব্যবস্থা করা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, ধার-কর্জ্জ ক'রে আসন্ন বিপদকে কোনমতে এড়ানো গেলেও গৃহস্থ এই ব্যবস্থার ওপর নির্ভর ক'রে বেঁচে থাকতে পারে না। তার জন্যে প্রয়োজন নূতন সামাজিক, অর্থ-নৈতিক ভিত গ'ড়ে তোলার। এই গ'ড়ে তোলার কেন্দ্রস্থলে যে ব্যবস্থাটি

রয়েছে, সেটি হচ্ছে শিক্ষা-ব্যবস্থা। আদিম সমাজ গ'ড়ে উঠত মানুষের একত্র থাকার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ভিত্তিতে। বর্ত্তমান কালে দেখা গেছে যে, একটা আদর্শ এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী সমাজকে গ'ড়ে তোলা সম্ভব। এই আদর্শকে সমাজ-মনে ছড়িয়ে দেওয়া হয় শিক্ষার ভেতর দিয়ে, তাই শিক্ষা সমাজ গঠনের কেন্দ্রে স্থান লাভ করেছে।

বাংলার সমাজ-জীবনের ধ্বংসস্তূপের ওপর নূতন সমাজের ভিত্তি স্থাপন করতে হ'লে আমাদের প্রয়োজন—পক্ষপাতহীন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমাদের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কারণ অনুসন্ধান করার, নির্ণীত কারণগুলি সমাজ-দেহ থেকে বিদূরিত করার এবং এই বিপর্য্যয়কে এড়িয়ে কি ক'রে জাতীয় অগ্রগমন সম্ভবপর সেটা স্থির করার।

আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রথম অর্থনৈতিক কারণ উৎপাদনের অভাব। আমাদের গ্রামগুলিতে আজও বৈজ্ঞানিক-জ্ঞানের চরণপাত ঘটে নি, অন্য দিকে কৃষি, বয়ন ইত্যাদি জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় উৎপাদন-ব্যাপারেও যে আমরা এত পেছনে প'ড়ে আছি, তার কারণ যুগ যুগ সঞ্চিত সহজ সবল মনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানও আমাদের গ্রাম্য সমাজে সঞ্চারিত হয় নি। ভূমিজ জ্ঞানকে অবজ্ঞা ক'রে আমরা তার প্রসার ও অগ্রগতি রুদ্ধ করেছি, ফলে বিজ্ঞানের বিকাশ আমাদের দেশে স্বাভাবিকভাবে জন্মগ্রহণ করে নি। আমরা আমাদের দুর্ভাগ্যের সবটুকু দায়িত্ব দৈন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে থাকি। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ও চেষ্টার অভাবই আমাদের দৈন্যের জন্য দায়ী নয় কি? আমাদের অন্ন নেই, জমি অল্প, অথচ ফলন কি ক'রে বাড়ানো চলে, সে শিক্ষা আমাদের নেই। আমাদের দেশের শতকরা আশিজন লোক চাষা, অথচ কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেবার কোন আয়োজন নেই আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে। শিক্ষা যে স্তরে উন্নীত হ'লে এবং অর্থের যে সামর্থ্য থাকলে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, কোন সত্যিকারের চাষী তাতে সেই বিদ্যা দ্বারা লাভবান হবার সুযোগ পায় কি না সন্দেহ। আমাদের যথেষ্ট বস্ত্র নেই, অথচ সূতা কাটা, বয়ন, রঞ্জন ইত্যাদি শেখবার কোন ব্যবস্থা নেই। আমাদের রোগের উৎপাতের অভাব নেই, অথচ একটুখানি ওষুধের জন্যে আমাদের বিদেশের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকতে হয়। এসব

বিষয়ে ভারতে যে কোন জ্ঞান ছিল না, তা নয়। রঞ্জনশিল্পে ভারতবর্ষ একদিন সর্ব্বাগ্রগামী ছিল, ভারতের মসলিন একদিন বিদেশের বাজারও ছেয়ে ফেলেছিল। কৃষি, বয়ন, আয়ুর্ব্বেদ ইত্যাদিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপন করতে যা প্রয়োজন, তা হচ্ছে শিক্ষা। গ্রাম্য সমাজের নাড়ীতে যে শিক্ষা নানা ভাবে প্রবাহিত ছিল, যার ফলে ভারতবর্ষ ধনী হতে পারুক না পারুক, নিজের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে অক্ষম হ'ত না, আমরা সেই শিক্ষাকে রুদ্ধ ক'রে মাথায় একটা প্রকাণ্ড অজানা শিক্ষার বোঝা চাপিয়েছি। চারপাশে যেখানে বায়ুমণ্ডল রয়েছে সেখানে মাথার ওপর বায়ুমণ্ডলের চাপটা সুসহ, কিন্তু চারদিকে বায়ুর অভাব ঘটলে মাথার ওপরের চাপ আমাদের সহজেই গুঁড়িয়ে দিতে পারে। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষার চাপটা তেমনিতর একটা একতরফা চাপ, তাই এ আমাদের বিকাশের সহায়তা না ক'রে ধ্বংসের সহায়তা করছে। এ কথা সত্য যে, আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তায় অনুর্ব্বর ভূমিতেও বাংলা দেশের সুজলা সুফলা ভূমির চাইতে উৎপাদন অনেক বেশিগুণ করা সম্ভব হয়েছে। শিক্ষার অভাবেই আমাদের চারিদিকে ছড়ানো অজস্র প্রাকৃতিক সম্পদকে আমরা ব্যবহার করতে পারি না, অথচ এইগুলি কুড়িয়ে নিয়ে বিদেশী বণিক তাদের অর্থের ঝুলি পূর্ণ ক'রে তোলে। আমরা প্রায়ই দেশকে শিল্পপ্রধান ক'রে তোলার কল্পনা করি, কিন্তু ভেবে দেখি না যে, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিকাশ না হ'লে উচ্চতর বিজ্ঞানের স্বাভাবিক স্ফুরণ হতে পারে না। আমাদের চারদিকে যে পরিবেশ রয়েছে আমরা তা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি, তাই আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি কুঁকড়ে আছে। সভ্যতার মহীরুহ শূন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, তার শেকড় মেলার জন্যে জমির প্রয়োজন—সেই জমি জনসাধারণের মন। আমাদের দেশে জমি তৈরি নেই, তাই বিজ্ঞান এখানে শেকড় মেলতে পারছে না।

উৎপাদন বাড়ানো আমাদের প্রধান সমস্যা সত্য; কিন্তু উৎপাদন বাড়ালেই দুঃখ ঘোচে না। বিজ্ঞানের দান আগুনের মত; এ দিয়ে যেমন প্রদীপ জ্বালানো

চলে, তেমনই শিশুর হাতে এ গৃহদাহের উপকরণও হয়ে উঠতে পারে। পাশ্চাত্যের রঙ্গভূমিতে বিজ্ঞানের আবির্ভাব ঘটেছে বহুদিন, কিন্তু বিজ্ঞান সেখানে গড়েছে যত ভেঙেছে তার চাইতে অনেক বেশি; আর সেই বিরাট বহ্নিদাহের লোলুপ রসনা স্পর্শ করছে সমগ্র জগৎকে। এইটেই—শুধু আমাদের সামনে নয়, সমগ্র জগতের সামনে—সবচেয়ে প্রকাণ্ড সমস্যা। বিজ্ঞান উৎপাদনকে বাড়িয়ে দিয়েছে শতগুণে, কিন্তু মানুষের লোভকে প্রশমিত করতে পারে নি। এই লোভই রয়েছে আমাদের সকল দুঃখ, সকল অবিচার, অত্যাচার ও অন্যায়ের মূলে। বিজ্ঞান যেখানেই আত্মপ্রকাশ করুক না কেন, সকল সত্যের মত তা স্বপ্রকাশ। আজ হোক কাল হোক বিজ্ঞানের আবিষ্কার সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে, কি ক'রে এর অপব্যবহার না ক'রে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় একে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করতে পারব, এই হ'ল আমাদের সামনে সবচাইতে বড় সমস্যা।

বিজ্ঞানকে মানুষের প্রকৃত সেবায় প্রয়োগ করার যে প্রচেষ্টা পাশ্চাত্যে রূপ পেয়েছে, তার ভিত্তি রাষ্ট্রশক্তি ও ঐশ্বর্য্যের ওপর। লোভকে তারা জয় করতে চায়নি, তারা চেয়েছে ঐশ্বর্য্যকে স্ফীত ক'রে লোভকে অহেতুক করতে। ধনকে তারা ব্যক্তির কবলমুক্ত ক'রে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে, সম্পদ ও সুখকে ক'রে তুলতে চেয়েছে সুলভ। তাই সমগ্র রাষ্ট্রের ধনোৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থাকে করায়ত্ত না ক'রে তাদের গঠনপ্রচেষ্টা কার্য্যকরী হতে পারে না। তারা যে সমাজ সৃষ্টি করতে চেয়েছে, তা থেকে প্রভূত ধনবানকে তারা ছেঁটে ফেলতে চায় সবলে, নির্দ্দয়ভাবে। পৃথিবীকে তারা স্বীকার করে উপভোগের বস্তুরূপে; পৃথিবীকে সুন্দর ক'রে তুলতে চায় উপভোগ করবে ব'লে। তাদের আনন্দটা ভোগের আনন্দ। এই আনন্দের যারা বাধা, তাদের নির্ম্মমভাবে ছেঁটে ফেলতে তাদের কোন দ্বিধা নেই। এইজন্য এই ব্যবস্থায় হৃদয়ের পরিবর্ত্তনের দিকে কোন দৃষ্টি নেই। তাদের ধারণা—চোর চুরি করে তার অভাবেরই জন্যে; মন নামক

বস্তুটার একটা অস্তিত্ব দিতে তারা নারাজ। মনটা বাস্তব অবস্থারই একটা প্রতিফলন মাত্র—এই তাদের সিদ্ধান্ত। ইতিহাসের যতটুকু আমরা জানি তাতে আমরা দেখতে পাই যে, বার বার হিংসা দ্বারা সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা হয়েছে, প্রতি বারই সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। যে ধ্বংস ও হত্যার ভিত্তিতে সমাজ গড়ার চেষ্টা হয়, তারই নির্ম্মমতার মধ্যে থাকে আত্মনাশের বীজাণু। আদিম সমাজে মানুষ একদিন এক সাম্য-ব্যবস্থার মধ্যে ছিল, সে সাম্য স্বাভাবিকভাবেই ভেঙেছে মানব-মনের বিভিন্নমুখিতা ও বিভিন্ন যোগ্যতার জন্য। এই বৈচিত্র্য সৃষ্টির স্বাভাবিক বিকাশ। আমাদের সমাজ-গঠনে যা প্রথম প্রয়োজন, তা হচ্ছে এই বৈচিত্র্যকে একটি সর্ব্বব্যাপী ঐক্যের বন্ধনে বাঁধবার। কান মুচড়ে মনের স্বভাব বদলানো, লাঠির ঘায়ে অন্ধকার তাড়ানোর মত। হিংসার রূপায়ন-বিভেদে, এর ভিত্তির ওপর তাই ঐক্যবদ্ধ সমাজ গ'ড়ে উঠতে পারে না।

ভারতের আশা ভাষা পেয়েছে সত্য ও অহিংসার বাণীতে। সত্য স্বরূপকে যাঁরা স্বীকার করেন, তাঁরা অস্বীকার করেন জগতের অসুন্দর রূপটিকে। জঞ্জালে যে স্থানটি আকীর্ণ হয়ে আছে, তার সত্যকার রূপটি প্রকাশ পাচ্ছে না। সেই স্থানটির তখনকার যে রূপ, সে রূপ মিথ্যা। জঞ্জাল সরিয়ে নিন, স্থানটি প্রকাশ পাবে, তার সত্যিকারের রূপটি ধরা পড়বে। মানুষের যে হিংসাসঙ্কীর্ণ, হিংসাকুটিল রূপটি আমরা দেখে থাকি, তা তার সত্যিকারের রূপ নয়। মানুষ যে নিজেরই অজ্ঞাতসারে নিজের গণ্ডিকে বিস্তৃত ক'রে সমগ্র বিশ্বকে নিজের মধ্যে অনুভব করতে চায়, তার প্রমাণ সমগ্র ইতিহাস জুড়ে রয়েছে—এটুকু না থাকলে সমাজ গ'ড়ে তোলো, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনির্ব্বাণ সাধনা, অন্যায় এবং নিষ্ঠুরতার প্রতি সার্ব্বজনীন ঘৃণা অসম্ভব হ'ত। যুগমানব যাঁরা এসেছেন, তাঁরা স্বার্থপঙ্কিল কুৎসিত পৃথিবীকে অস্বীকার করেছেন; তাঁরা চেয়েছেন এই বিকৃতির আড়ালে যে সুন্দর শাশ্বত রূপটি আছে তারই আভাস দিতে, তাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন আবিলতা থেকে পৃথিবীকে, মানব-মনকে মুক্ত করতে। এই আত্মনিয়োগ রূপ পেয়েছে

অহিংসার মধ্যে। রোগ হয়েছে ব'লে ডাক্তার রোগীকে মেরে ফেলেন না, তা'হ'লে চিকিৎসা-ব্যাপারটি অনেক সোজা হয়ে যেত। রোগ যতই কুৎসিত এবং কঠিন হোক না কেন এবং তাতে রোগীর যতই অপরাধ থাকুক না কেন, ডাক্তারের কর্ত্তব্য হচ্ছে নিষ্ঠা ও সেবা দিয়ে, সমগ্র জ্ঞানকে প্রয়োগ ক'রে রোগীকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করা; তবু যদি রোগী না বাঁচে, তবে ডাক্তারের জ্ঞানের অভাব তার কারণ হতে পারে, কিন্তু তার চেষ্টার অভাবের অভিযোগ করা চলে না। লোভ ও হিংসার বিকৃতি মনের সব চাইতে কঠিন ব্যাধি এবং অহিংসা-প্রচেষ্টা চিকিৎসকের প্রচেষ্টা। অহিংসার বাণী যাঁরা প্রচার করেন তাঁরা মনে ক'রে থাকেন যে, আমাদের সামাজিক ব্যাধিগুলি আমাদের মানসিক বিকৃতিরই পরিণাম। বিন্দু বিন্দু বালুকণা যখন জড় হয়, তখন তাকে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করা অতি সহজ; কিন্তু বিকৃত অসুস্থ মন যখন যুগের পর যুগ এই সামান্য কর্ত্তব্যগুলিকে অবহেলা করে, তখন যে জঞ্জালের স্তূপ জড় হয় তা পরিষ্কার করা দুঃসাধ্য, কখনও কখনও বা প্রায় অসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। জঞ্জালকে জোর ক'রে সরিয়ে দিলেই স্থানটির ভবিষ্যৎ পরিচ্ছন্নতা নিরাপদ হয় না। সামাজিক জঞ্জাল দূর ক'রে দিয়ে একটা ক্ষণিক চাকচিক্য হয়তো আনা সম্ভব, কিন্তু সমাজ-মন যদি ঘুমন্ত থাকে তবে সমাজদেহে আবার জঞ্জাল জমতে থাকবে। আমাদের আসল প্রয়োজন অসতর্ক, ঘুমন্ত, রোগগ্রস্ত মনকে জাগ্রত ক'রে তোলা। মনকে লাঠি দিয়ে স্পর্শ করা যায় না, মনকে স্পর্শ করতে হয় মন দিয়েই। এই স্পর্শ দেবার জন্যে প্রয়োজন ভালবাসার, যার মধ্য দিয়ে নিজেকে খুঁজে পাওয়া যায় অন্যের মধ্যে। এই ভালবাসাই বিভিন্নধর্মী মনের মধ্যে একটা ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের সমাজ-গঠনে তাই প্রয়োজন অহিংস কর্ম্মপ্রচেষ্টার ভিত্তি,—এর জন্যে প্রয়োজন গভীর মানসিক শিক্ষা, যে শিক্ষা আমাদের দৃষ্টিকোণ বদলে সমাজকে নূতনভাবে দেখতে শেখাবে।

পাঁচ

আমাদের জাতীয় শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে আমাদের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার জন্য। যেখানে রাষ্ট্রের স্বার্থ জনগণের স্বার্থের সঙ্গে এক নয়, সেখানে সর্ব্বপ্রকার জাতীয় প্রচেষ্টা রাষ্ট্রীয় কারণে ব্যাহত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যে সামাজিক ব্যাধি সমগ্র বাংলাকে আজ মৃত্যুর দ্বারে টেনে এনেছে, তার প্রথম এবং প্রধান লক্ষণ হচ্ছে লোভ এবং অজ্ঞতা, এবং তা পুষ্টিলাভ করেছে জাতীয় পরাধীনতার অন্ধকার ছায়ায়। অর্থহীন সঞ্চয়ের রথচক্রে আটকা প'ড়ে যারা সহস্র লোকের মৃত্যুর কারণ হয়েছে, তারা যে ডালের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, সেই ডালটিকে কাটতেই ব্যস্ত। তাদের এই মত্ততাকে ক্রূরতা না বলে মূঢ়তা বলাই যুক্তিযুক্ত। আর যে অগণ্য জনসাধারণ চাকার নীচে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, তাদের যূথবদ্ধতা ভয়ত্রস্ত পশুর মত—একের পর আর এককে গুঁড়িয়ে যেতে দেখেও তারা দলবদ্ধভাবে পেষণের চক্রটিকে আটকে দিতে চেষ্টা করে না। এই নিশ্চেষ্টতার কারণ গভীর অজ্ঞতা। এদের চালিয়ে নিয়ে বেড়ায় অন্ধ সংস্কার, যুক্তি এখানে দানা বেঁধে উঠতে পারে না। আমরা অন্য দেশের পণ্যবিক্রয়ের কেন্দ্র, সুতরাং আমাদের উৎপাদন বাড়লে আমাদের শাসকদের ক্ষতি, এইজন্য আমাদের উৎপাদন বাড়াবার শিক্ষার ব্যবস্থা কোথাও নেই। আমরা যখন শিক্ষালাভের স্বপ্ন দেখছি, তখন আমাদের শাসকেরা শিক্ষাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করছেন, যাতে আমরা গ'ড়ে উঠছি কেরানী হয়ে, আমাদের সঙ্গে দেশের প্রকৃত পরিবেশের ঘটছে একটা পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ। আবার এই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ব্যয়বহুল ক'রে বহুর নিকট শিক্ষাকে অগম্য ক'রে রাখা হয়েছে এবং এই ভাবে জাতির মধ্যে গ'ড়ে তোলা হয়েছে একটা নিরর্থক জিনিসকে নিয়ে লোভ এবং অবিশ্বাসের ব্যবধান।

আমাদের এই সমস্যার সমাধান ক'রে দেবার মত কোন ব্যবস্থাই পাশ্চাত্যের ভাণ্ডারে নেই। শিক্ষাকে সংস্কৃত করতে সেখানে সর্ব্বদাই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া গেছে; সুতরাং পরিকল্পনা রচনা সেখানে যেমন সহজ হয়েছে, তেমনই

অর্থাভাবেও পরিকল্পনার রূপায়ন ব্যাহত হয় নি। সুতরাং আমাদের দেশের সামনে যে সমস্যা, তার কোন নজির ওখানে নেই। আমাদের জাতীয় সম্পদ নেই। আমাদের প্রয়োজন তা বাড়িয়ে তোলার, অথচ অর্থের সামর্থ্য বা রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্ব কোনটাই নেই আমাদের। এই রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্ব আমাদের হিংসা দিয়ে লাভ করার কোন সামর্থ্যও নেই, আর তাকে আমরা শ্রেয় ব'লেও মনে করি না। অথচ আমরা সমাজ-সংস্কারের যে আদর্শ গ্রহণ করতে চাই, তাতে বাস্তব অবস্থার পরিবর্ত্তনই যথেষ্ট নয়, আমরা সঙ্কল্প নিয়েছি মনকে নূতন ক'রে গ'ড়ে তোলার, দৃষ্টিকোণকে সম্পূর্ণভাবে বদলে দেবার।

এই নূতন প্রচেষ্টার পরিকল্পনার রূপায়ন হয়েছে বুনিয়াদী শিক্ষার কর্ম্মতালিকায়। এই শিক্ষা-প্রচেষ্টা অভূতপূর্ব্ব এবং সমগ্র জীবনকে ও মানব-সমাজকে নূতন ক'রে গড়ার প্রচেষ্টা, সুতরাং নূতন সমাজের ভিত্তি বা বুনিয়াদ গড়বে ব'লে একে 'বুনিয়াদী' অথবা সম্পূর্ণ নূতন কর্ম্মপন্থা ব'লে 'নইতালিম' অথবা 'নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা' নাম দেওয়া চলে। আমরা শেষোক্ত নামেরই পক্ষপাতী, কারণ 'বুনিয়াদী' কথাটাকে আমরা প্রায়ই 'অভিজাত' কথাটার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলি। এই নূতন শিক্ষা-প্রণালী আমাদের বর্ত্তমান অভিজাত শিক্ষা-প্রণালীকেই ভাঙতে চায়, সুতরাং যে নামটাতে বার বার ভুল হবার সম্ভাবনা আছে প্রথম থেকেই সেই নামটাকে পরিবর্ত্তন করা ভাল।

আমাদের জাতীয় পরাধীনতা আমাদের পরম দুর্ভাগ্যের কারণ সন্দেহ নেই, কিন্তু কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের চাবি যাদের হাতে তাদের ছেঁটে ফেলে দিলেই স্বাধীনতার ভিত্তি গ'ড়ে উঠবে না। যে সবল, যে সুস্থ, তাকে কেউ অধীন ক'রে রাখতে পারে না। অধীনতার মূল উৎস দুর্ব্বলতা, অক্ষমতা, অসুস্থতা। কায়ার যেমন ছায়া, তেমনই দুর্ব্বলতা ও অধীনতার মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। পরাধীনতা যেমন আমাদের দুর্ব্বলতার কারণ, আমাদের দুর্ব্বলতাও তেমনই আমাদের পরাধীনতার মেয়াদকে দীর্ঘতর করার কারণ। নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থার তাই প্রথম লক্ষ্য দেহে ও মনে সুস্থ এবং সবল মানুষ গ'ড়ে তোলা। শিশু যদি সুস্থ, সবল মানুষ হয়ে গ'ড়ে

ওঠে, তবে সমাজে আসবে নূতন জীবন, নূতন শক্তির প্রবাহ এবং তারই ফলে পরাধীনতার বন্ধন আপনি খ'সে পড়বে। সুস্থ দেহ গ'ড়ে তোলার জন্য মানুষের জড়তাকে জয় করা প্রথম প্রয়োজন এবং সেই জড়তাকে জয় করতে হ'লে যেমন দরকার আদর্শ নেতা, তেমনই প্রচুর এবং স্বাস্থ্যকর অন্ন-বস্ত্র-পরিবেশ। এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি হ'লে কাজ আরম্ভ করার জন্য রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্বের প্রয়োজন নেই। রাষ্ট্র আমাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে প্রথম হতেই ব্যাহত করার ফলে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যগুলিও ভুলে ছিলুম; এই ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যগুলির প্রতি আমাদের সচেতন ক'রে দেওয়াই নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনার প্রথম কর্ম্মসূচী।

আমাদের দেশের দৈন্য অবশ্যস্বীকার্য্য, অথচ আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই জাতীয় সম্পদ উৎপাদনে কোন অংশ গ্রহণ করে না। নূতন ব্যবস্থায় প্রত্যেকে জাতীয় সম্পদ উৎপন্ন করার কাজে লাগবে। এই ভাবেই শুধু রাষ্ট্রীয় ধনভাণ্ডারের ওপর কর্ত্তৃত্ব না থাকা সত্ত্বেও দৈন্যকে দূর করার এবং জীবনের মানকে উন্নত করার চেষ্টা আরম্ভ করা চলে। বস্ত্র আমাদের নেই, কেনার মত অর্থও নেই আমাদের, অথচ মিলের দিকে হাঁ করে চেয়ে আমরা ব'সে থাকি। বিদ্যালয়ে যদি আমরা শস্য উৎপাদনের মূল সূত্রগুলি আয়ত্ত করতে পারি, বস্ত্রের জন্য যদি আমরা প্রথম হতেই আত্মনির্ভর হবার চেষ্টা করি, তবে ক্ষুধার অন্ন এবং পরিধেয়ের জন্য আমাদের মৃত্যু বরণ করতে হবে না, এটুকু অন্তত জোর ক'রে বলা যায়।

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রধানত আপত্তি করা হয়ে থাকে যে, তাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশের বাধা জন্মাবে। জীবনের দুটি দিক আছে। এক দিক থেকে আমাদের জীবন নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মপ্রবাহ! শিক্ষাকে যদি আমরা জীবনের জন্য প্রস্তুতি ব'লে মনে করি, তবে শিক্ষা কর্ম্মের সমস্যা-সমাধানেরই শিক্ষা! আমাদের জীবনের কর্ম্ম বহুমুখী, সুতরাং একই কর্ম্মকে নানা দিক থেকে দেখা চলে। যেমন ধরা যাক, একটি লোক কৃষিকর্ম্মের জন্য শিক্ষা লাভ করছে। তার মাটি চেনা দরকার, কোন্ মাটি কি বীজের উপযুক্ত তা জানা দরকার, কি সারের

প্রয়োজন তার জ্ঞান দরকার, কোন্ বীজ কোথায় পাওয়া যায়, কি দামে তা বিক্রি হয়, তার ব্যবহার, উপকার, চাহিদা কি রকম—এই সমস্তই তার জানা প্রয়োজন। এই ভাবে বিজ্ঞান, ভূগোল, মাতৃভাষা, অঙ্ক, অর্থশাস্ত্র সব কিছুই তাকে শিখতে হবে। এই ভাবে শিক্ষার একটা প্রধান লাভ এই যে, জ্ঞানটা পুঁথিগত হয় না, প্রকৃত পরিবেশের সঙ্গে নিবিড় যোগসাধনের ফলে জ্ঞানটা গভীর এবং চিরস্থায়ী হয়ে থাকে। ফলে জ্ঞান বোঝা হয় না, স্বাভাবিক বিকাশের রূপ গ্রহণ ক'রে থাকে। কিন্তু তাই ব'লে বিষয়গতভাবে জ্ঞানকে দেখার প্রয়োজন নেই, সে কথা সত্য নয়। শরীরের পুষ্টিসাধনের জন্য ব্যায়ামের প্রয়োজন আছে, কিন্তু কেবল হাতের বা পায়ের কিংবা বুকের ব্যায়াম করলে শরীরের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে না। সেজন্য বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যায়াম সম্পর্কে একটা সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকা সম্ভব। বুনিয়াদী শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থায় কোন শিক্ষক কাজ করাতে গিয়ে হয়তো ছাত্রকে এক দিকে বহুদূর অগ্রসর করিয়ে দেবেন, অন্য দিকে অনগ্রসর রাখবেন—এমনটি ঘটা সম্ভব, কিন্তু কাজের ভেতর দিয়ে শিক্ষাদানের ফলে সকল সমস্যা সম্বন্ধেই শিশু মোটামুটিভাবে নিজেরই গরজে জেনে নেবে, এটুকু আশা করা যেতে পারে। আজও এই নূতন প্রচেষ্টার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রচিত হয়নি সেকথা সত্য, কিন্তু এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী শিক্ষাকে এমন একটা নূতন রূপ দিয়েছে, যার ফলে শিক্ষা-ব্যবস্থার একটা নূতন যুগ সূচিত হচ্ছে বলা যেতে পারে।

ছয়

আমরা এ পর্য্যন্ত মোটামুটিভাবে চারটি বিষয় আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। পর্য্যায়ক্রমে নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনার প্রস্তাবগুলিকে বিশদভাবে বিশ্লেষণ ও বিচার করার আগে এ পর্য্যন্ত আলোচিত মূল বক্তব্যগুলির সংক্ষিপ্ত পর্য্যালোচনা ক'রে নেওয়া যাক।

আমাদের প্রথম বক্তব্য হচ্ছে—শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষার কাজ—মানুষের দেহমনের পূর্ণবিকাশ-সাধন এবং জীবনের জন্য প্রস্তুতিকরণ। মানুষের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, সে তার দেহের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সে যেখানে তার একান্ত ব্যক্তিগত সুখদুঃখের মধ্যে সীমাবদ্ধ, একান্ত দৈহিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার মধ্যে পরি-সমাপ্ত, সেখানে সে অন্য ইতর প্রাণীর সগোত্র; কিন্তু যেখানে সে নিজের মধ্যে অসীমের অনুভূতি লাভ করে, যেখানে সে আপনার অবিনশ্বর আত্মাকে সমাজ-মানসের মধ্যে দেখতে পায়, সেখানে সে অনন্য। মানুষের ভালবাসা সর্ব্বগামী, এরই মধ্য দিয়ে সে বিশ্বের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পায়, দেহের সীমাকে অতিক্রম ক'রে অন্যের মধ্যে নিজকে পরিব্যাপ্ত করতে পারে; মানুষের যুক্তি ব্যক্তিনিরপেক্ষ, এটাই তার বৃহত্তর সত্তার ইঙ্গিত, এখানেই তার সমষ্টি-জীবনের ভিত্তি। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তিকে ব্যবহার ক'রে পরিবেশকে বুঝতে পারে এবং প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবস্থার দ্বারা পরিবেশকে আয়ত্ত ক'রে জীবনের মানকে উন্নত করতে পারে। এইখানেই মানুষ স্রষ্টা, প্রকৃতিসহকর্মী—কেবল সংস্কারান্ধ জীব নয়। মানুষের এই দুইটি দিকের বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য; শিক্ষা (১) মানুষের এই বৃহত্তর সত্তার উপলব্ধিকে জাগ্রত করে, এবং (২) পরিবেশের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় সাধন করিয়ে মানুষকে স্রষ্টারূপে মর্য্যাদা লাভের উপযুক্ত ক'রে গ'ড়ে তোলে।

আমাদের দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে এই যে, আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের এই মূল লক্ষণগুলি পরিস্ফুট নয়। আমাদের মধ্যে উদার হৃদয়বৃত্তির লেশমাত্র নেই, ঐকের অভাব কুৎসিতভাবে বিদ্যমান, ভালবাসার কোন বন্ধন নেই, যুক্তির অগ্নিশিখা কুসংস্কারের ভস্মস্তূপে চাপা প'ড়ে আছে, এজন্য আমরা আমাদের বৃহত্তর সত্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। পৃথিবীর সমাজ-জীবনে হিংসা, দ্বেষ, রক্তপাতের কারণ এইখানে। আমাদের যূথবদ্ধতা ভয়ত্রস্ত পশুর মত, ক্রিয়াশীল মননশক্তিসম্পন্ন মানুষের মত নয়। দ্বিতীয়তঃ পরিবেশের সঙ্গে আমাদের কোন পরিচয় নেই। আমাদের

চারদিকে যে অজস্র প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, তাকে আমরা ব্যবহার করতে জানি না। জীবনের মানকে উন্নত করা দূরের কথা, পশু-পাখিরও জীবনধারণের যে স্বাভাবিক নৈপুণ্য আছে, তাকেও আমরা হারাতে বসেছি ; এর কারণ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে আমরা সজাগ ও ক্রিয়াশীল ক'রে তুলতে পারি নি, আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তিকে সবল ও সর্ব্বজয়ী করতে পারি নি। তজ্জন্য আমাদের মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তির অভাব ঘটেছে, আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এটাই আমাদের ব্যবহারিক জীবনে সর্ব্বাধিক দুর্ভাগ্যের কারণ।

আমাদের এই হীনতা ও মানুষ নামের অযোগ্যতা থেকে উদ্ধার ক'রে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করার যোগ্যতা আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির নেই—এই হচ্ছে আমাদের তৃতীয় বক্তব্য। যে সভ্যতার আওতায় এবং যাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিকল্পনা অনুসারে এই শিক্ষা-পদ্ধতি গ'ড়ে উঠেছে, তার জাতি হ'ল বৈশ্য জাতি, বৃত্তি বণিকবৃত্তি! এ শিক্ষা তাই মানুষ গড়ার কাজে নিয়োজিত হয় না, হয় খরিদ্দার, কেরানী ও অন্ধ মজুর গড়ার কাজে। তাই এই শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যেই এমন কতগুলি ব্যবস্থা অন্তর্নিহিত রয়েছে, যা প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশের পরিপন্থী। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার অক্ষমতা ও অযোগ্যতার এই মূল কারণগুলি আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। কারণগুলি এই :—(১) এই ব্যবস্থা প্রতিযোগিতাকেই জাগ্রত করে, সহযোগিতাকে নয়, ব্যক্তিকেই প্রধান ক'রে তোলে, বিভেদকে প্রাধান্য দেয়—তাই এ শিক্ষা আমাদের বৃহত্তর সত্তাকে উপলব্ধি করতে শেখায় না, সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেয়। (২) এই ব্যবস্থা শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে একটা উপেক্ষা অবজ্ঞা ও ঘৃণার ভেদ সৃষ্টি ক'রে জাতীয় বা সমষ্টিগত জীবনের ঐক্যকে বিনষ্ট করতে সাহায্য করে। (৩) এ শিক্ষার মারফৎ আমরা কতগুলি সংবাদমাত্র শিখি—শিক্ষাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার কোন ব্যবস্থা এতে নেই, তাই দেহমনের বিকাশে, জীবনে শিক্ষাকে কার্য্যকরী করে তুলতে এ শিক্ষা আমাদের কোন কাজে লাগে না। (৪) বর্ত্তমান শিক্ষার মধ্যে কোন জীবনাদর্শ

নেই, এ কেবল চাকুরির জন্য প্রস্তুতি ; তাই কোন আদর্শকে জীবনে রূপান্তরিত করতে এ শিক্ষা আমাদের সাহায্য করে না, কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় চাকুরিকে কেন্দ্র ক'রে আমাদের মধ্যে আত্মকলহকে জাগিয়ে দেয়। (৫) এ শিক্ষা আমাদের গোড়া থেকেই নির্ভরশীল ক'রে তোলে, বিনা পরীক্ষাতে বিশ্বাস করতে শেখায় ; এর ফলে আমাদের স্বাধীন, স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আচ্ছন্ন থাকে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরাধীনতার বন্দে দৃঢ়তর হয়। (৬) প্রকৃতির সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যোগসাধনের কোন ব্যবস্থা এই শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে নেই, তাই আমরা পরিবেশ থেকে পালিয়ে কল্পলোক গড়তে শিখি, পরিবেশকে আয়ত্ত করতে শিখি না—এ দ্বারা আমাদের সৃজনীশক্তি লোপ পায়, প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করার যোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়। বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হওয়া ও তার সমাধান করাই মানুষের জয়যাত্রার ইতিহাস ; এই সাহস ও বুদ্ধিই মানুষকে বেঁচে থাকতে ও জয়যুক্ত হতে সাহায্য করেছে ; পক্ষান্তরে পরিবর্ত্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলার অপটুতা, সমস্যার বিশ্লেষণ ও সমাধানের অক্ষমতার জন্যই মানুষের চাইতে বহুগুণে শক্তিমান জীবকেও পৃথিবীর বুক থেকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হতে বাধ্য করেছে। বর্ত্তমান শিক্ষা পরিবেশ ও তার সর্ব্বব্যাপী সমস্যার সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে আমাদের এই সহজ পটুত্বকে নষ্ট ক'রে দিচ্ছে, আমাদের অগ্রগতিকে রুদ্ধ ক'রে রেখেছে এবং আমাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। (৭) বর্ত্তমান শিক্ষা আমাদের কর্ম্মবিমুখ হতে শেখায়, এবং যেহেতু কাজের মধ্য দিয়েই আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি ও বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশ লাভ করে, সেজন্য এই শিক্ষা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সচেতন ও কর্ম্মক্ষম করতে না পারায় আমাদের জীবনের অযোগ্য ক'রে তোলে।

চতুর্থত, আমরা নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল যুক্তি ও প্রস্তাবগুলি অতি সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। অন্যান্য দেশে শিক্ষার রূপান্তরের মধ্য দিয়ে দেখা গেছে যে, শিক্ষাই মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে।

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি আমাদের সম্পূর্ণ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে আমাদের পূর্ণতর মনুষ্যত্বের দিকে এগিয়ে দিতে পারে না, কারণ এর লক্ষ্যও তা নয়, পদ্ধতিও অযোগ্য। তাই এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। গান্ধীজীর অনুপ্রেরণায় এবং হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘের উদ্যোগে যে নূতন পরিকল্পনার খসড়া জাতির সামনে ধরা হচ্ছে, তার মূল প্রস্তাব চারটি—(১) শিক্ষাই যদি মানুষকে গড়ে, তবে প্রত্যেকের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা দরকার। (২) শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া দরকার, কারণ তা হ'লে (ক) শিক্ষা-ব্যবস্থা যে আমাদের সৃজনীশক্তিকে জাগ্রত করতে পেরেছে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলবে, এবং (খ) এই শিক্ষা কোন রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হবে না, অথবা বিত্তকৌলিন্যে শিক্ষাকে কুক্ষিগত ক'রে রাখা চলবে না। (৩) শিক্ষা কর্ম্মকেন্দ্রিক হওয়া প্রয়োজন; কারণ আমাদের জীবন নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মপ্রবাহ। এই কর্ম্মপ্রবাহ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে যে শিক্ষা, সে সংবাদবহের কাজ, জীবনকে গড়ার শিক্ষা নয়; সুতরাং জীবনের মধ্য দিয়ে, কর্ম্মের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে জীবনের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। (৪) শিক্ষার সুস্পষ্ট লক্ষ্য থাকা একান্ত আবশ্যক এবং সে লক্ষ্য হওয়া উচিত আদর্শ মানুষ ও আদর্শ সমাজ গ'ড়ে তোলা। মানুষের উৎকর্ষ হচ্ছে তার মহত্ত্বে, তার শক্তি-বুদ্ধিবৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশে। বুদ্ধি দ্বারা মানুষ সত্যকে জানবে, নূতন নূতন উদ্ভাবনী দ্বারা শক্তিমান হয়ে উঠবে এবং সেই শক্তিকে মঙ্গল দ্বারা বিধৃত ক'রে রাখবে তার ভালবাসা। এই সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য যে ভিত্তির প্রয়োজন, সে হচ্ছে সত্য ও অহিংসার ভিত্তি। সুতরাং নূতন পরিকল্পনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ হচ্ছে এমন কর্ম্মসূচী রচনা করা, যার মধ্য দিয়ে সত্যের প্রতি গভীর নিষ্ঠা এবং অন্যের প্রতি ভালবাসা শিক্ষার্থীর মধ্যে গ'ড়ে উঠবে।

এই চারটি মূল প্রস্তাবের মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ প্রস্তাব সম্পর্কে কোন মতানৈক্য থাকার কারণ নেই এবং এর মর্ম্মার্থও এত সহজ যে এর তত্ত্ব নিয়ে বিস্তারিত

আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। তাই আমরা এই প্রবন্ধে প্রথম দুইটি প্রস্তাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করব। তৃতীয় ও চতুর্থ প্রস্তাবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা বুনিয়াদী শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কিত গ্রন্থে করার ইচ্ছা রইল। প্রস্তাব চারটিই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, সুতরাং প্রত্যেকটি প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ আলাদা ক'রে বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর নয়, তবু আমরা যতদূর সম্ভব পর্যায়ক্রমে প্রস্তাবগুলিকে আলোচনা করব।

শিক্ষার সঙ্গে স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্বের যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে, তা উপলব্ধি করতে পারলে প্রত্যেকটি লোকের জন্য শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করা কেন প্রয়োজন, এই প্রস্তাবটির মর্মগ্রহণ করা সহজ হবে। শিক্ষাকে আমরা বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ক'রে রাখি নি—এই কথাটিকে আমরা ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার করেছি। চোখ কান হাত পা আমাদের সকলেরই আছে, কিন্তু আমরা তাদের সক্রিয় ও সচেতন ভাবে ব্যবহার করি না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভ্যাসের বশে অন্ধভাবে ব্যবহার ক'রে থাকি। বিশেষ এবং বৈজ্ঞানিক ভাবে এদের ব্যবহার করতে হ'লে শিক্ষার প্রয়োজন এবং সচেতনভাবে এদের ব্যবহার ক'রে পরিবেশের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ে আসাই শিক্ষা। এই শিক্ষার প্রয়োজন পদে পদে। যে বিরাট পরিবেশের মধ্যে আমরা বাস করছি, যে বিরাট জগৎ এবং প্রাণীসমাজ আমাদের চারপাশে রয়েছে, তাকে না জানলে, তার মধ্যে সহজভাবে বাস ও বিচরণ করা সম্ভব নয়। ইউরোপে একটা যুদ্ধ বাধলে ভারতের অখ্যাত পল্লীর সামান্য একটি চাষীর জীবনে কি বিপর্যয় আসে, তা সে জানে না ব'লেই সকল দুর্ভাগ্যের জন্য অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া তার আর কোন উপায় নেই। একমাত্র শিক্ষা দ্বারাই আমরা পরিবেশকে জানতে পারি, তাকে আয়ত্ত ক'রে জীবনের সমাধান করতে পারি। এ শিক্ষা আমাদের নেই ব'লেই পরের কথামত অন্ধভাবে আমাদের চলতে হয়।

শিক্ষা ছাড়া স্বাধীনতা অসম্ভব। স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচার নয়—স্বাধীনতা স্বেচ্ছায় নিয়মকে মেনে চলা। নিয়ম যেখানে বাইরের জিনিস, তাকে যখন জোর ক'রে

চাপিয়ে দেওয়া হয়, তখন নিয়ম থাকে বন্ধন ; কিন্তু অন্তরের স্বতঃউৎসারিত প্রেরণায়, যুক্তি ও বিচারের ফলে যখন নিয়মকে স্বেচ্ছায় মেনে নেওয়া যায়, তখন নিয়ম আর বন্ধন থাকে না। প্রকৃতির নিয়মকে আমাদের বাধ্য হয়ে মেনে চলতে হয় জানি, নিয়মকে লঙ্ঘন ক'রে স্বাধীনতার কোন স্থান প্রকৃতির রাজ্যে নেই। মাধ্যাকর্ষণের নিয়মকে অবহেলা ক'রে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়তে গেলে আমাদের বুদ্ধিহীনতার জন্য দণ্ড পেতেই হবে। কিন্তু তাই ব'লে কি আমাদের আকাশে ওড়ার ইচ্ছাকে বাস্তবে পরিণত করা সম্ভবপর হয় নি? এ সম্ভবপর হয়েছে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ দ্বারা, শিক্ষা দ্বারা প্রকৃতির নিয়মগুলিকে ভাল ক'রে বুঝতে পেরে—প্রাকৃতিক নিয়মগুলির সাহায্য নিয়েই। এই জ্ঞান আমাদের যেদিন ছিল না, এই স্বাধীনতাও আমাদের সেদিন ছিল না। এমনই ক'রে আমাদের স্বাধীনতা বেড়ে চলে আমাদের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে, অজ্ঞতার বন্ধনগুলি যতই খ'সে খ'সে পড়ে, ততই আমরা বাস্তব ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে থাকি। প্রকৃতির বেলাতে যা সত্যি, সমাজের বেলাতেও তা সত্যি। সমাজ-জীবনে অবাধ স্বাধীনতা হচ্ছে স্বেচ্ছাচার। সমাজ তা দিতে পারে না, কারণ তাতে সমাজ-জীবন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে, সমাজ-জীবনের ভিত্তি ভেঙে পড়ে। এখানেও কতগুলি মূল নিয়ম রয়েছে, যা মেনে চলা অপরিহার্য্য। কিন্তু যতক্ষণ না প্রত্যেকটি ব্যক্তি সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের কথা উপলব্ধি ক'রে স্বেচ্ছায় নিয়মকে মেনে চলে, ততক্ষণ সমাজে থাকে চোর আর পুলিসের সমাজ, তাতে প্রকৃত স্বাধীনতা থাকতে পারে না। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থকে বুঝতে শিক্ষার প্রয়োজন—এবং শিক্ষা ছাড়া স্বাধীনতা অর্থহীন। এটা কোন শিক্ষাব্রতীর স্বপ্ন নয়—এই সত্যকে বুঝতে পেরেছিলেন ব'লে লেনিনকেও একদিন বলতে হয়েছিল "In an illiterate country it is impossible to build a communist state." আমার মনে হয় লেনিনের কথাটাও অর্দ্ধসত্য মাত্র, কারণ আক্ষরিক জ্ঞান দ্বারা মানুষ সমাজের স্বার্থকে বুঝতে সমর্থ হয় না। রবীন্দ্রনাথ এই কথা অতি স্পষ্ট ক'রে বলেছেন। তাই তিনি ভাবগদ্গদ

আবেগ-সর্ব্বস্ব স্বদেশী-আন্দোলনের মঞ্চ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, যতক্ষণ না শিক্ষার কঠিন ভিত্তির ওপর সমাজকে দাঁড় করানো সম্ভব হবে, ততক্ষণ ক্ষমতার রূপান্তর বা হস্তান্তর হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা—পরাধীনতার উৎকট রোগের উপযুক্ত ঔষধ মিলবে না।

কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা আনতে পারে না। স্বাধীনতা যেমন চেয়ে পাবার জিনিস নয়, তেমনই জোর ক'রে কেড়ে এনে বিলিয়ে দেবার জিনিসও নয়—স্বাধীনতাকে অর্জ্জন করতে হয়। স্বাধীনতা পশুরও আছে; অষ্ট্রেলিয়া বা আফ্রিকার আদিম অধিবাসীর মধ্যেও স্বরাজ্যের অভাব নেই—কিন্তু স্বাধীনতা বা মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতে তাদের স্থান খুব উঁচুতে নয়। তাদের পক্ষে স্বাধীনতার কল্পনাই হয়তো অসম্ভব। স্বাধীনতা ব্যক্তিগত, এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যেখানে আছে সেখানে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আসতে বাধ্য; কিন্তু এর বিপরীত কথাটা ঠিক নয়। ইউরোপের জাতিগুলি রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন, কিন্তু আমরা ভাল ক'রেই জানি যে, কতকগুলি বৃহত্তর রাষ্ট্রের অঙ্গুলি-সংকেতে তাদের চলতে হয়, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাদের গোলামি করতে হয় বৃহত্তর রাষ্ট্রগুলির স্বার্থে। এ থেকে হয়তো মনে হতে পারে, বৃহত্তর রাষ্ট্রের লোকেরা স্বাধীন। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে দেখা যাবে যে, তারাও গোলামি করছে মুষ্টিমেয় ধনপতির বা শাসকগোষ্ঠীর কায়েমী স্বার্থের। যে ধনোৎপাদনের যন্ত্রগুলি বৃহত্তম রাষ্ট্রগুলির সৌভাগ্য ও শক্তির কারণ, তাতে যে অসংখ্য লোক কাজ করে, তারা সেই যন্ত্রের অংশ মাত্র—ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তারা অন্যকে শাসন এবং শোষণ করার যন্ত্র। এরা যে কত হতভাগ্য তা তারা জানে না, তাই তারা একটুখানি আর্থিক সৌভাগ্যের মোহে তুষ্ট থাকে। বর্ব্বর জাতিগুলির লোকেরা যেমন বিজ্ঞান-অধ্যুষিত জগতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা জানে না ব'লেই তাদের নিজেদের প্রাগৈতিহাসিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই তুষ্ট, তেমনিই আমাদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠতর স্বাধীনতার কোন কল্পনা নেই ব'লে আমরা খানিকটা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই তুষ্ট। দুনিয়ার কোটি কোটি লোক মুষ্টিমেয় লোকের তাঁবেদারি করছে, তার কারণ জ্ঞানের অভাব,

শিক্ষার অভাব, আত্মশক্তির সম্বন্ধে সচেতনার অভাব। ধনীর শাসনের যন্ত্র তারা, শোষণের অস্ত্র তারা—কারণ অজ্ঞতার জন্য তারা নিজেদের দাবি জানে না, নিজেদের সংঘশক্তি সম্বন্ধে একান্ত অজ্ঞ। শুধু জ্ঞানের আলোক জালিয়ে এদের সচেতন ক'রে তোলা চলে। এদের একমাত্র নিজের অধিকার দাবি করার আন্দোলনই সত্যাগ্রহ-আন্দোলন—সুতরাং সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের কেন্দ্রে রয়েছে শিক্ষা। পৃথিবীর সব কিছু আছে দরিদ্রের হাতে—এরাই উৎপাদন করে, এরাই সৈন্য হয়ে লড়তে যায়, এরাই জলে স্থলে অন্তরীক্ষে পণ্য ব'য়ে বেড়ায়—এদের আছে সব, ব্যবহার করতে জানে না; দাবি আছে, চাইতে জানে না। সত্যাগ্রহ-আন্দোলন আমাদের দেশে বার বার বিফল হয়েছে তার কারণ সেই আন্দোলনের পেছনে জনবল এবং মনোবল কিছুই ছিল না, এবং এই না থাকার কারণ—সচেতনতা এবং শিক্ষার অভাব। রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বপ্রকার সংগ্রাম বন্ধ ক'রে আমাদের শিক্ষাগার খুলতে হবে—এটা আমার বক্তব্য নয়; আমি বলতে চাই যে, সমগ্র দেশের জন্য প্রকৃত শিক্ষা-ব্যবস্থা গ'ড়ে তোলার কাজই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মূল প্রচেষ্টা। সত্যই যদি স্বাধীনতা আসে এবং সমগ্র দেশের যাঁরা প্রকৃত মঙ্গলকামী তাঁদের হাতে যদি ক্ষমতা ন্যস্ত হয়, তবে দেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পথ সুগম হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু ভিত্তি যতক্ষণ দৃঢ় না হয়, ততদিন তার সম্ভাবনা আছে কি? আজ আমাদের দেশে স্বাধীনতা এসেছে কিন্তু বাজেটের অঙ্কের ঘরে দেখছি সৈন্য পুলিশের জন্য ব্যয় বরাদ্দ বাড়াতেই বাধ্য হয়েছি আমরা, শিক্ষার সম্প্রসারণ আমাদের সাধ্যায়ত্ত হয়নি আজও। সেজন্য সরকারকে দায়ী করা যেতে পারে, কিন্তু সে কি এই বাস্তব সমস্যার সমাধান! আসল কথা আমরা যোগ্য হয়ে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিনি, তাই সমাজে শিক্ষাকে, সংস্কৃতিকে তার ন্যায্য আসনে বসান আমাদের শক্তিতে কুলিয়ে উঠছে না। যতদিন মানুষ সংস্কৃতির থেকে গায়ের জোর, বুদ্ধির জোরকে শ্রেষ্ঠ আসন দেবে ততদিন চোর পুলিসের সমাজ ব্যতীত

অন্য সমাজ গড়ে তোলা কিছুতেই সম্ভব নয়। শাসন এবং শোষণ চলে অজ্ঞতার সুযোগ নিয়েই। বহুদেশে রাষ্ট্রবিপ্লব হয়ে গেছে, স্বাধীনতার যুদ্ধে বহুদেশ জয়লাভ করেছে, কিন্তু সর্ব্বত্রই ক্ষমতা র'য়ে গেছে মুষ্টিমেয় কয়েক জনের হাতে—জন-সাধারণের হাতে সে ক্ষমতা এসে পৌছয় নি। শিক্ষাহীন লোকের উন্মত্ত প্রতিহিংসাসিক্ত রাজত্ব কতখানি ভয়াবহ তার দৃষ্টান্ত ফরাসী এবং রুশবিপ্লবের ইতিহাসে আছে; তাই স্বাভাবিকভাবেই শক্তিহীন জনসাধারণের হাত থেকে ক্ষমতা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সমাজের হাতে চলে যায়, এর ব্যতিক্রম আজ পর্য্যন্ত কোথাও হয় নি। এইজন্য জনসাধারণের প্রকৃত স্বাধীনতা যদি আমাদের আদর্শ হয়, তবে আমাদের কর্মসূচীর প্রথম কাজ হওয়া উচিত—সার্ব্বজনীন শিক্ষা।

সার্ব্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হ'লে জীবনের বিভিন্ন পর্য্যায়ের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। আমাদের দেশে বিভিন্ন বয়সের অসংখ্য নরনারী অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে ডুবে আছে, সুতরাং নবজাত শিশু হতে আরম্ভ ক'রে অতিবৃদ্ধদের পর্য্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। এ বিষয়ে বয়স্কদের শিক্ষার প্রতি আমাদের বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন; কারণ এরাই অশিক্ষা ও কুসংস্কার দ্বারা গৃহের পরিবেশকে আবিল ক'রে রাখে। ময়লা কাপড় পরা, গৃহের চারিদিক অপরিষ্কার রাখা, যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করা, অশিষ্ট ও অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করা, এগুলি শিশুরা শেখে বয়স্কদের কাছ থেকেই। শিশুর অনুকরণ-প্রবৃত্তি অসাধারণ এবং এই কচি বয়সে তার কোমল মনে যা বার বার দাগ কেটে যায়, তাকে শিক্ষা দ্বারা মুছে দেওয়া কঠিন। এইজন্য সুস্থ সুন্দর পরিবেশ রচনার কাজ একটি প্রধান কাজ এবং তা সম্ভবপর একমাত্র বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে।

হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘ যে কর্ম্মসূচী রচনা করেছেন, তাতে শিক্ষাকে চারিটি পর্য্যায়ে ভাগ করা হ'য়েছে :—

(১) প্রাক্‌বুনিয়াদী শিক্ষা—সাত বৎসরের কমবয়স্ক শিশুদের শিক্ষা।

(২) বুনিয়াদী শিক্ষা—সাত থেকে চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত বালক-বালিকাদের শিক্ষা।

(৩) উত্তরবুনিয়াদী শিক্ষা—বুনিয়াদী পর্য্যায়ের পরের বিশেষ বৃত্তিমূলক শিক্ষা।

(৪) বয়স্কদের শিক্ষা—যারা আর্থিক বা অন্য কোন কারণে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ হতে বঞ্চিত তাদের সকলের শিক্ষার ব্যবস্থা।

এবার আমাদের নূতন পরিকল্পনার দ্বিতীয় প্রস্তাব—শিক্ষাকে কি ক'রে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ক'রে তোলা যায়, সে সম্বন্ধে আলোচনা করবার চেষ্টা করব।

মানবতার পূর্ণ বিকাশ এবং ঐক্যবদ্ধ, শান্তিপূর্ণ ও সুনিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থা গঠনের জন্য সার্ব্বজনীন শিক্ষার প্রয়োজন; কিন্তু শিক্ষাকে সার্ব্বজনীন ক'রে তোলার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধারূপে দাঁড়িয়ে আছে জনসাধারণের অপরিসীম দৈন্য। এই দারিদ্র্য এমন সর্ব্বব্যাপী যে, একে জয় ক'রে কোন শুভকর প্রচেষ্টাকে আমাদের দেশে ফলপ্রসূ করা সম্ভবপর কি না, সে সম্বন্ধে অনেকেরই সন্দেহ আছে। পৃথিবীর সকল দেশ যখন প্রগতিশীল জ্ঞানবিজ্ঞান প্রসূত নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলে বিত্তে, সম্পদে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে, আমরা আমাদের সুসভ্য শাসকদের সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থার ফলে অজ্ঞতা, দারিদ্র্য ও মৃত্যুর দিকেই পা বাড়িয়ে চলেছি। অগাধবিত্তশালীর ধনকে কপর্দ্দকহীন দরিদ্রের ঘাড়ে চাপিয়েও আমাদের দৈনিক গড়পড়তা মাথাপিছু আয় বড় জোর দুই আনা। জনসাধারণের মাথার ওপর দৈন্যের এই জগদ্দল বোঝা এত দুঃসহ ও প্রত্যক্ষ যে, একে ডিঙিয়ে দূরের দিকে দৃষ্টি দেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব। উদয়াস্ত পরিশ্রম ক'রে এবং ক্ষুধার অন্ন ও পরিধানের বস্ত্রটুকু জোটাবার মত উপার্জ্জন করতে পারে না। অন্নবস্ত্রের অভাবে ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে জনসাধারণের একটা প্রকাণ্ড অংশ রোগজর্জ্জর দেহে কর্ম্মহীন অক্ষম জীবন যাপন করে। সহস্র যোগ্যতা থাকলেও দৈন্য এদের আত্মবিকাশের পথ রুদ্ধ ক'রে দাঁড়ায়। ছোট ছেলেটিও ব্যবহৃত হয় মাঠে গরু

চরাবার জন্যে, দুপুরে ক্ষেতে খাদ্য পৌঁছে দেবার জন্যে। এই কচি বয়সেই, যোগ্যতার কোন পরিচয় দেবার সুযোগ পাবার আগেই, এদের অধিকাংশের 'বড়লোকের' দাসত্ব স্বীকার করতে হয় পোড়া পেটের অন্ন জোটাবার জন্যে। মেয়েদের তো কথাই নেই—তাদের নইলে সন্তানবহুল শ্রীহীন গৃহস্থালী অচল হয়ে ওঠে; ক্ষুদে গৃহিণীর মত মায়ের পিছু পিছু ছুটাছুটি করতে করতেই অপটু ও অশিক্ষিত দেহমন নিয়ে সত্যিকারের গৃহস্থালীর গুরু বোঝা বইবার জন্য ডাক আসার সময় এসে যায়। এই ভাবে সমগ্র স্বাধীন সত্তাকে বিসর্জ্জন দিয়ে পশুর মত জীবনযাপন ক'রে যাদের কখনও দুটো পয়সা ব্যয় বাঁচাতে হয়, কখনও দুটো পয়সা ঘরে আনতে হয়, তাদের বিদ্যালয়-গৃহে কেতামাফিক সেজেগুজে গিয়ে, বইশ্লেট কিনে, প্রতিদিনকার জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কবিহীন শিক্ষালাভের জন্য দৈনিক চার-পাঁচ ঘণ্টা নিরুদ্বেগে কাটিয়ে আসার মত সময় কিংবা সামর্থ্য কোথায়? তাই আমাদের দেশের শতকরা নব্বুইটি লোক শিক্ষাকে অভিজাতদের একচেটিয়া সম্পত্তি ব'লে গণ্য ক'রে থাকে; দূরে দাঁড়িয়ে অক্ষম অসহায় হরিজনের মত হয়তো শিক্ষার মন্দিরকে প্রণাম জানায়, কিন্তু ভেতরে ঢোকার সাহস সঞ্চয় ক'রে উঠতে পারে না। এই চিত্তকৌলিন্যগত জাতিভেদই আমাদের সার্ব্বজনীন শিক্ষা-পরিকল্পনার প্রথম সমস্যা।

বিদ্যালয়ের ব্যয় কমিয়ে দিয়ে দরিদ্রের জন্য দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দেওয়া সম্ভবপর—এ কথা ভাববারও কোন কারণ নেই। শিক্ষার জন্য আমাদের দেশে যা ব্যয় করা হয়ে থাকে, তা যে কোন সভ্য দেশের তুলনায় নগণ্য। বিদেশী শাসকের রাষ্ট্রশাসনের বহুবিধ যন্ত্রকে যথাবিধি তৈলসিক্ত করার পর যেটুকু উচ্ছিষ্ট থাকে, তারই সামান্য একটা অংশ মাত্র শিক্ষার জন্য ব্যয় করা চলে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক জগতের সর্ব্ববিধ ব্যাপারের মত এখানেও সমগ্র ব্যয়ের মোটা অংশটাই মুষ্টিমেয় লোকের মুষ্টিগত হয়ে পড়ে। তৈলসিক্ত মস্তকে তৈলসিঞ্চন করাই এই জগতের নীতি, শিক্ষার বেলাতেও তার ব্যতিক্রম ঘটে না; ফলে সামান্য কয়েকজন

সৌভাগ্যবান স্বল্প পরিশ্রমে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন আহরণ ক'রে থাকেন, অথচ সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি যাঁদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, সেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়টুকুও জোটে না। পারিশ্রমিকের এই অন্যায় ও অযৌক্তিক তারতম্য আমাদের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে পঙ্গু ক'রে রেখেছে বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের অধ্যাপকের সাহায্যের প্রয়োজন অল্প, কারণ এই বয়সে এবং শিক্ষার এই স্তরে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় জ্ঞান আহরণ করা সহজ—কলেজের ছুটির বরাদ্দটাও তাই এত দীর্ঘ, অথচ একটা সরকারী কলেজের একজন অধ্যক্ষের জন্য যা ব্যয় করা হয়ে থাকে, দুই-তিন শো জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের জন্যও তা করা হয় না। অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বেসরকারী। সেগুলিতে যন্ত্রপাতি, গৃহাদি, গ্রন্থাগার, অর্থ-সাহায্য সব কিছুরই অভাব। সুতরাং বিদ্যালয়গুলিকে বেঁচে থাকতে হয় নিছক ব্যবসাদারি করে, ছাত্রসংখ্যা বাড়াবার নানা রকম ফন্দি এঁটে। উপযুক্ত শিক্ষক ও যন্ত্রপাতির অভাবে শিক্ষাটা প্রহসন হয়ে ওঠে এবং কোনমতে পরীক্ষা-পাসের সাধনাই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই সত্যিকারের জ্ঞানের ও কর্ম্মদক্ষতার অভাবই উত্তরজীবনে শিশুদের সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে ওঠে এবং অসহায়ভাবে অন্যের খেয়াল ও খুশির কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে বাধ্য করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা হয়তো মাসিক ৮।১০ টাকা মাইনে পেয়ে থাকেন ; তাও সর্ব্বদা জোটে না। সুতরাং শিক্ষার চিন্তাকে দূরে রেখে এঁদের উঞ্ছবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়। এসব জায়গায় শিক্ষকতা করতে যাঁরা এসে জোটেন, তাঁরা আসেন তাঁদের আর কিছু করার সামর্থ্য নেই বলেই। অথচ এই বয়সেই শিশুদের সর্ব্বগুণ এবং সর্ব্বাধিক সাহায্যের প্রয়োজন। এই সময় তাদের কচি মনের ওপর যে রেখাপাত ঘটে, উত্তরজীবনে তা মুছে ফেলা কঠিন ; এই সময়ে যে আদর্শের সামনে এবং যে পরিবেশের মধ্যে তারা মানুষ হয়ে ওঠে, তাই তাদের চরিত্রকে গঠিত করে। তাদের এই সময়কার শিক্ষাকে অবজ্ঞা ক'রে ভবিষ্যৎ শিক্ষার জন্যে সুব্যবস্থা করা গোড়া কেটে আগায় জল ঢালার মত।

এই গোড়াটাকে আমরা এতদিন পর্য্যন্ত নির্দ্দয়ভাবে কেটে চলেছি। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে নিপুণ, অভিজ্ঞ, উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকের প্রয়োজন আছে, তা আমরা ভাবতেও পারি না। আমরা যেমন লক্ষ লক্ষ লোকের অভাবে, ছুর্ভিক্ষে, মহামারীতে মরাটাকে অদৃষ্টের ঘাড়ে চাপিয়ে স্বাভাবিক ব'লে মেনে নিয়েছি, তেমনই শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই প্রকাণ্ড অব্যবস্থাটা আমাদের চোখে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এইটাই পরাধীন দেশের বিধিলিপি—শত শত কুৎসিত বীভৎসতা স'য়ে স'য়ে আমাদের চোখে স্বাভাবিক হয়ে যায়। তাই বিশ্বজোড়া নানা দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শ আমাদের চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়েই আছে। কৈশোরের প্রান্তসীমা অবধি কুশিক্ষার ফলে যখন ছাত্রছাত্রীরা ঠাকুরের বদলে বানর হয়ে গ'ড়ে ওঠে এবং তারপর কলেজী শিক্ষার ফলে কেবলমাত্র দম্ভ ও অকর্ম্মণ্যতা নিয়ে জীবনে প্রবেশ করে, তখন আমরা শিক্ষা জিনিসটাকে শাপান্ত ক'রে থাকি, কিন্তু ভেবে দেখি না যে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অব্যবস্থা ও শোচনীয় দুর্দ্দশাই এর প্রধান কারণ। শিক্ষকেরা জীবনযাপন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হ'লে তবেই শিক্ষার দিকে সম্পূর্ণ মনযোগী হতে পারেন, সেটা আমরা সর্ব্বদাই ভুলে যাই।

কিন্তু এজাতীয় নিতান্ত অযোগ্য বিদ্যালয়ের সংখ্যাও প্রয়োজনের তুলনায় একান্ত অল্প। আবার এই সব বিদ্যালয়ের কর্ম্মপন্থা গ্রামের দৈনন্দিন জীবন থেকে এত ভিন্ন যে, ছেলেপিলেরা একটু বড় ও কর্ম্মক্ষম হয়ে উঠলেই তাদের বিদ্যালয় থেকে সরিয়ে আনা হয়। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এলাকায় নীচের শ্রেণীতে যাও দু-চারটি ছেলেমেয়ে জোটে, তাদের সংখ্যাও দিন দিন ক্ষীণতর হতে থাকে এবং অসমাপ্ত অজীর্ণ শিক্ষা নিয়েই শিশুরা জীবনে প্রবেশ ক'রে সমাজকে দূষিত ক'রে তোলে।

সুতরাং আমাদের সামনে সমস্যাটি অদ্ভুত। শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যয়বণ্টনে হেরফের করার সুযোগ থাকলেও ব্যয়সঙ্কোচের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। ব্যয় আমাদের

বহুগুণে বাড়ানো প্রয়োজন—শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা দরকার। উপযুক্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী, যন্ত্রপাতি, গৃহাদির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে অল্পবয়স্ক শিশুদের এবং বয়স্কদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে, অথচ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঢোকার আগেই শিশুরা অস্বাস্থ্যকর কুৎসিত আবহাওয়ার মধ্যে কুসংসর্গে, অযত্নে জীবনের ভিত্তিটাকে জীর্ণ ক'রে তোলে। এই কুৎসিত পরিবেশন ও অযত্নের জন্য বয়স্কদের শিক্ষার অভাবই দায়ী; সুতরাং বিভিন্ন প্রকারে বহু বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন আমাদের আছে, অথচ সামান্য কয়টি অযোগ্য বিদ্যালয়ের নিম্নতম ব্যয়টুকু যোগাবার মত সামর্থ্যও আমাদের নেই।

অর্থের এই বিরাট প্রাচীরকে আমরা এতদিন অলঙ্ঘ্য বলেই ঘোষণা ক'রে এসেছি। এ যেন অচলায়তনের গগনস্পর্শী প্রাচীরের মত, একে নির্ব্বিবাদে সম্ভ্রম ক'রে চলাই রীতি। দূরে দাঁড়িয়ে ভয়বিহ্বল নেত্রে আমরা একে যুগ যুগ ধ'রে প্রণামই জানিয়ে এসেছি, পরখ ক'রে দেখিনি। নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনার আলোচ্য প্রস্তাবটি এই অন্ধ ভিত্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রথম সুর। এই সমস্যা সমাধানের জন্য নূতন পরিকল্পনা দুইটি সূত্রের উপর নির্ভর করছে। এই আর্থিক প্রাচীরটা গ'ড়ে ওঠার কারণ এই যে, আমরা কড়ি যোগাই জ্ঞানের জন্য নয়, রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির জন্য। তাই কড়ি যাদের বেশি, তারা সদর-দুয়ারে এবং খিড়কির দরজা দিয়ে কড়ি যুগিয়ে স্বীকৃতিটুকু আদায় ক'রে নেয়, পরে ঐ ফরমানখানার বলে খরচের দশগুণ আদায় ক'রে নেবে এই আশায়। কিন্তু সরকারের গোলামখানায় স্থান সঙ্কীর্ণ, তাই ধাক্কাধাক্কি ও নীচতার অন্ত থাকে না। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানলাভ, মানুষ হ'য়ে গ'ড়ে ওঠা, যদি আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার লক্ষ্য হয়, তবে এই সমস্যা দানা বেঁধে উঠতে পারে না। প্রথমত, মানুষের প্রথম লক্ষণ হচ্ছে তার ব্যাপক স্বরূপের উপলব্ধি। শিক্ষা যদি এই উপলব্ধি এনে দিতে পারে, তবে অর্থের কোন প্রাচীর গ'ড়ে ওঠাই সম্ভবপর নয়। মনুষ্যত্বের দ্বিতীয় লক্ষণ হচ্ছে সৃজনী-শক্তি। শিক্ষা যদি

মানুষকে স্রষ্টা ক'রে তুলতে পারে, তবে সে প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে নিজের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সহজেই সংগ্রহ ক'রে নিতে পারে।

আমাদের দেশে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ভিক্ষাবৃত্তি ক'রে চলতে হয়, তাই দাতার স্বার্থ অনুযায়ী এর ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। জনসাধারণের সাধ্য নাই যে, তারা শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করতে পারে। স্থতরাং শিক্ষাকে রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রভাব ও আবিলতা থেকে মুক্ত ক'রে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার একমাত্র উপায় হচ্ছে একে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ক'রে তোলা। কি ক'রে শিক্ষাকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ক'রে তোলা যায়, সেটাই বিবেচ্য।

নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থায় জন্মমুহূর্ত্ত থেকে মরণকাল অবধি সকল সময়ের জন্যই শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজনীয় ব'লে অনুভূত হয়েছে। এই অনুসারে শিক্ষাকে চারিটি পর্য্যায়ে ভাগ করা হয়েছেঃ (১) ৩ থেকে ৭ বৎসর পর্য্যন্ত প্রাক্‌বুনিয়াদী শিক্ষা, (২) ৭ থেকে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত বুনিয়াদী শিক্ষা, (৩) ১৪ থেকে উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষা, (৪) বয়স্কদের শিক্ষা। সকল পর্য্যায়েই অবশ্য হস্তশিল্প ও খেলাধূলার মারফৎ শিক্ষা দেওয়া হবে।

এর মধ্যে প্রাক্‌বুনিয়াদী, উত্তরবুনিয়াদী ও বয়স্কদের এই প্রণালীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থার ফলাফলের কোন হিসাব আমাদের সামনে নেই। কিন্তু এটা স্থস্পষ্ট যে, প্রাক্‌বুনিয়াদী পর্য্যায়ে শিশুদের হস্তশিল্পজাত পণ্য বিক্রয় করে এদের শিক্ষা কিছুতেই স্বাবলম্বী হতে পারে না। বস্তুত এই পর্য্যায়ে ব্যয়টাই আছে, আয়ের ঘরে কিছুই নেই। বয়স্কদের শিক্ষাও অধিক ভাবে স্বাবলম্বী হবে এ কথা ভাবা কঠিন। কারণ সারাদিন নিজের দৈনন্দিন কাজে প্রাণপণ শ্রম করার পর বিদ্যালয়ের জন্য পণ্য তৈরী ক'রে তারা নিজেদের শিক্ষার ব্যয় নিজেরাই বহন করবে, এটা কষ্ট-কল্পনা। ছয় বৎসরের বুনিয়াদী পর্য্যায়ের শিক্ষার অভিজ্ঞতা ও আয়ব্যয়ের হিসাব আমাদের সামনে রয়েছে। এতে দেখা যায় যে, হাতের কাজ শেখাতে ব্যয় যত হয়, আয় তার তুলনায় কমই হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের তৈরী জিনিষ বাজারে নিপুণ কারিগরদের রচনা বা যন্ত্র-

শিল্পের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারে না। তা ছাড়া এ ব্যবস্থার একটি প্রধান কথা এই যে, যান্ত্রিক নৈপুণ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি না দিয়ে শিশুর দেহমনের বিকাশের দিকেই বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে। তার ফলে পণ্য পরিমাণে তৈরী হবে কম। তা ছাড়া শিক্ষকের জন্য পঁচিশ টাকার যে বরাদ্দ করা হয়েছে, সেটা পর্য্যাপ্ত নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বুনিয়াদী শিক্ষায় আমাদের বর্ত্তমান প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে একীভূত ক'রে দেওয়া হয়েছে। আমাদের এখনকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গুলিতে শিক্ষকরা পঁচিশ টাকার বেশী আয় ক'রে থাকেন এবং তাতে অতি ক্লেশেই তাঁদের দিন কাটাতে হয়। আদর্শ বিদ্যালয়ে এদের জীবনের মানকে আরও নীচুতে নামিয়ে দিতে হবে, এটা আদর্শ হতেই পারে না। পঁচিশ টাকা মাইনেতে শিশুমন সম্পর্কে অভিজ্ঞ, বুনিয়াদী শিক্ষাদানের মত যথেষ্ট শিক্ষিত হস্তবিদ্যায় নিপুণ শিক্ষক পাওয়া কঠিন। গান্ধীজীর প্রভাবে ও আহ্বানে দেশপ্রেমের টানে কেউ কেউ এসে হয়তো জুটতে পারেন, কিন্তু এই উত্তেজনার ওপর নির্ভর ক'রে একটা স্থায়ী ভিত্তি গ'ড়ে তোলা অসম্ভব। বর্ত্তমান পরিকল্পনার স্বল্প ব্যয় যোগাবার মত উপার্জ্জনও বিদ্যালয়ের তৈরী পণ্য বিক্রয় ক'রে হয় না, এ অবস্থায় খরচ আরও বাড়লে খরচ সঙ্কুলান করা কি ক'রে সম্ভব তা ভাবা কঠিন এবং আর্থিক পরিপূর্ণ স্বাবলম্বন সম্বন্ধে গান্ধীজীর বক্তব্যকে অবাস্তব ব'লে উড়িয়ে দেওয়া স্বাভাবিক।

আমাদের হিসাবে প্রকাণ্ড ভুল থেকে যাচ্ছে দুটী কারণে। প্রথমতঃ আমরা বিভিন্ন পর্য্যায়কে আলাদা ক'রে ভাবছি। দ্বিতীয়তঃ সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে সমাজের কেন্দ্রে স্থাপন না ক'রে আমাদের অভ্যাসগত একে সমাজ থেকে আলাদা ক'রে দেখবার চেষ্টা করছি।*

---

* আমার এই বিশ্লেষণ অনেক আগের। আর্থিক স্বাবলম্বনকে কেন্দ্র করে এর পর অনেক আলোচনা হয়েছে। আমার এখানকার বক্তব্য সম্পর্কে আমার মত এখনও পরিবর্ত্তিত হয় নি। কিন্তু এ সম্পর্কে আরো বক্তব্য বেড়েছে। আর্থিক স্বাবলম্বনকে আমি স্বাবলম্বনের একমাত্র সংজ্ঞা বলে মনে করি না। শিল্পের কাজ ঠিক ভাবে, বৈজ্ঞানিক ভাবে শিক্ষা নেওয়া হলে যথেষ্ট উৎপাদন অবশ্যম্ভাবী;

কোন একটি বিশেষ পর্য্যায়ে শিক্ষা স্বাবলম্বী হতে পারে না। সঙ্গে যে
প্রদীপনটি দেওয়া গেল, এটি একটী কেন্দ্রীয় শিক্ষানিকেতনের চিত্র। এ রকম একটি
কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে কি ক'রে কেন্দ্রটি অচিরকাল মধ্যে স্বাবলম্বী ও
স্বয়ংসম্প্রসারণশীল হয়ে উঠতে পারে, এই কথাটাই প্রথমে আলোচনা করার চেষ্টা
করব। ৭-১৫ বৎসরকে আমি একটি পর্য্যায় মনে করি। তালিমী-সঙ্ঘ নানা কারণে
বুনিয়াদী পর্য্যায়ে সীমা ১৪ বৎসর রাখলেও, আমার মনে হয় এটা ১৫ বৎসর হওয়া
উচিত। এদিকে বুনিয়াদী পর্য্যায়ে ৭ বৎসরের স্থলে ৮ বৎসর থাকা প্রয়োজন বলে
মনে হয়।*

শিক্ষাকে স্বাবলম্বী করতে হ'লে প্রয়োজন শিক্ষকের। নূতন পরিকল্পনায়
শিশুদের জন্যে পুঁথিপত্র, বইখাতা, শ্লেট পেন্সিলের প্রয়োজন অল্প, বিশেষ ক'রে নীচের
শ্রেণীগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের তরফ থেকে প্রয়োজন—স্বাস্থ্য, উৎসাহ, কর্ম্মক্ষমতা এবং
হাতিয়ারের। বাগানের কাজ এবং সূতাকাটার জন্য যে সব হাতিয়ারের প্রয়োজন,
তা বহু ব্যয়সাধ্যও নয়, জটিলও নয়; ঐগুলি বহুলাংশে নিজেরাই তৈরী ক'রে নেওয়া
চলে, তার জন্যে পরের ওপর নির্ভর ক'রে থাকার প্রয়োজন হয় না। প'ড়ো জমির
অভাব গ্রামে নেই এবং গ্রামের লোকেরা যদি কেন্দ্রীয় গ্রামের অবস্থা দেখে আশাশীল
হয়ে ওঠেন, তবে বিদ্যালয়গৃহের স্থান বা বাঁশ-খড়ের চালার জন্যে ভাববার বিশেষ
প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না। মোট কথা, নূতন শিক্ষাব্যবস্থার গ্রামে শেকড়
মেলার জন্যে প্রয়োজন গ্রামবাসীর উৎসাহ এবং গরজ ও উপযুক্ত শিক্ষকের। কেন্দ্রীয়

কিন্তু আর্থিক স্বাবলম্বন শিক্ষামূলক শিল্পের উদ্দেশ্য হতে পারে না। বিদ্যার্থীকে শিক্ষার কাজে এবং
আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য, আর্থিক স্বাবলম্বন বৈজ্ঞানিক মর্ম্ম-
পদ্ধতির অবশ্যম্ভাবী ফল। এ সম্পর্কে বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতি ২য় খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করার
চেষ্টা করব।

* সম্প্রতি হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘের পেরিয়ানায়কম্পালয়মের অধিবেশন বুনিয়াদী শিক্ষার
কাল সাত বৎসরের জায়গায় আট বৎসরই হবে বলে স্থিরীকৃত হয়েছে।

গ্রামের এই শিক্ষা দ্বারা উন্নতি হয়—এটা প্রত্যক্ষ দেখলে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে এই শিক্ষাকে কায়েম করার ইচ্ছা স্বাভাবিক ভাবেই জন্মাবে। সুতরাং আমাদের সমস্যা উপযুক্ত শিক্ষকের সমস্যা।

বয়স ১৮-২০ **গবেষণা** :—

বয়স্কদের শিক্ষা

১। উচ্চতর কলাশিক্ষা

২। উচ্চতর বিজ্ঞান

৩। উচ্চতর শিক্ষকতার শিক্ষা

৪। শিক্ষকতায় বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করেন নাই তেমন শিক্ষকদের শিক্ষা

৫। উচ্চতর শিল্প শিক্ষা

৬। গ্রাম্য কারিগরদের সাময়িক শিক্ষা

বয়স ১৪-১৮ **বৃত্তি শিক্ষা** :—

এখানে যে কোন একটী বৃত্তিকে মূল কেন্দ্র ক'রে শিক্ষা দেওয়া হবে।

১। শিক্ষকতা

২। কৃষি, গোপালন, পোলট্রী

৩। খাদীর জ্ঞান

৪। গ্রাম্য চিকিৎসক ও গ্রাম্য স্বাস্থ্য পরিদর্শন

৫। ইঞ্জিনিয়ারিং

৬। হিসাব রাখা

৭। গ্রাম শিল্প ইত্যাদি

বয়স ১১-১৫ **বুনিয়াদি দ্বিতীয় পর্ব্ব** :—

এই পর্ব্বে প্রথম পর্ব্বে উল্লিখিত কর্ম্মকেন্দ্রগুলির মধ্য দিয়া সেলাই ভিন্ন অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া হবে। মাতৃভাষার পরিবর্ত্তে মাতৃভাষা ও সরল হিন্দী শিক্ষা দেওয়া

হবে। বাগানের কাজের বদলে কৃষিকার্য্য, সূতা কাটার বদলে সূতা কাটা, কাপড় বোনা, রঙ করা ও ছাপ দেওয়া শেখানো হবে। কাপড় বোনা ও কৃষিকাজের মধ্যে একটী বাধ্যতামূলক ভাবে শেখানো হবে। গ্রামের উপযোগী যে কোন অন্য একটি বৃত্তিকে সরকারী বৃত্তি হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। বাগানের কাজ ও সূতা কাটা বাধ্যতামূলক থাকবে।

বয়স ৭-১১ **বুনিয়াদী প্রথম পর্ব্ব :—**

এই চার বৎসর শিশুরা আত্মসচেতনা, প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা, সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা, সূতা কাটা ও বাগানের কাজ এই পাঁচটি কর্ম্মকেন্দ্রের মধ্য দিয়ে নিম্নলিখিত বিষয়ে শিক্ষা লাভ করবে :—(১) মাতৃভাষা (২ ইতিহাস, (৩) ভূগোল, (৪) ব্যবহারিক সমাজ-বিজ্ঞান, (৫) বিজ্ঞান, (৬) সঙ্গীত, (৭) অঙ্ক, (৮) সেলাই, (৯) ব্যায়াম নৃত্য ও খেলাধূলা ও (১০) চিত্রাঙ্কন।

এই এক বৎসর শিশুরা তকলির ব্যবহার, মাতৃভাষা, গণনা, পর্য্যবেক্ষণ, অঙ্কন, ব্যায়াম ও সঙ্গীত শিক্ষালাভ করবে।

বয়স ৩-৬ :—

এই বয়সে শিশুরা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে আহার এবং খেলাধূলা করবে। এদের সুন্দর স্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে নিয়মানুবর্তী ক'রে গ'ড়ে তোলাই বিদ্যালয়ের লক্ষ্য। এদের শিক্ষণীয় বিষয় হবে পরিচ্ছন্নতা, সমবেত ভাবে কাজ করার ক্ষমতা, মাতৃভাষা।

প্রদীপনটি দেখলে সহজেই বোঝা যাবে যে, বুনিয়াদী পর্য্যায়ের শিক্ষা শেষ করার পর ছাত্রছাত্রীরা যোগ্যতা ও রুচি অনুসারে বৃত্তিশিক্ষা গ্রহণ করবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই প্রণালীতে শিক্ষা কোথাও আমাদের বর্ত্তমান পুঁথিগত বিদ্যার মত নয়। প্রত্যেকটী বিষয়েই শিক্ষা ব্যবহারিক শিক্ষা হবে। সুতরাং শিল্প শিক্ষা যারা লাভ করবেন, তারা শিল্পের সকল সমস্যা ও সমাধান

সম্বন্ধেই শিক্ষা গ্রহণ করবেন। তাঁদের মারফৎ গ্রামে শিল্প উৎপাদন ও বিক্রয়কেন্দ্র গ'ড়ে উঠবে। শিক্ষকতার শিক্ষা যাঁরা গ্রহণ করবেন, তাঁরা শিক্ষকতার মধ্য দিয়েই সে শিক্ষা পাবেন। এমনই ভাবে শিল্প, চিকিৎসা, পূর্ত্তশিক্ষা প্রভৃতি ব্যবহারিক হবে। ডাক্তার গ্রামের রোগগুলির পর্য্যবেক্ষণ ও চিকিৎসার মধ্য দিয়েই পাঠ সুরু করবেন, বৃত্তিশিক্ষায় গ্রামের পথ ঘাট বাড়ী ইত্যাদি মেরামত থেকে আরম্ভ করেই শিক্ষার পথে এগিয়ে চলবেন।

উত্তরবুনিয়াদী পর্য্যায়ের কাজ আরম্ভ হবার এক বৎসরের মধ্যেই শিক্ষকতার জন্যে যাঁরা শিক্ষা লাভ করবেন, তাঁরা শিশুশ্রেণীগুলিতে পাঠ দেবার কাজ আরম্ভ করবেন, কারণ নিজেদের ভুল ত্রুটি সমস্যার মধ্য দিয়েই তাঁদের শিক্ষা এগিয়ে চলবে। এঁরা যে কেবল কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকের অভাব পূর্ণ করবেন তা নয়, তাঁদের সাহায্যে নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলিতেও শিক্ষাকেন্দ্র খোলা সম্ভবপর হবে, এবং এঁদের শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন কেন্দ্রগুলিতে উচ্চ হতে উচ্চতর শ্রেণী পরিচালনা করা যাবে। এঁরাই কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সাহায্যে নূতন কেন্দ্রগুলিতে পুঁথির অভাব মেটাবেন। এখানে পারিশ্রমিকের কোন প্রশ্ন নেই, কারণ এঁরা বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবেই শিক্ষাদানের কাজ করবেন, পেশাদার শিক্ষক হিসাবে নয়। শিক্ষালাভ সমাপ্ত ক'রে এঁরা যখন বেরুবেন, তখন নূতন কেন্দ্র খোলার জন্যে বা পুরাতন কেন্দ্রের অভাব মেটাবার জন্যে এঁদের পাওয়া যাবে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা যাঁরা লাভ করবেন, বুনিয়াদী পর্য্যায়ের দীর্ঘ প্রস্তুতির পর তাঁরা নিপুণ শিল্পী হয়ে উঠবেন। তাঁদের তৈরি সামগ্রী বিদ্যালয়ের বিবিধ প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট হবে। সমবায়, ব্যাঙ্কিং ইত্যাদিতে যাঁরা বিশেষ শিক্ষালাভ করবেন, তাঁদের সাহায্যে বিদ্যালয় একটি সমবায়-কেন্দ্র হয়ে উঠবে। এর ফলে গ্রামের বিবিধ উৎপন্ন দ্রব্য ন্যায্য মূল্যে বিক্রীত হবার উপায়ও এঁরা করতে পারবেন এবং এ ভাবে গ্রামের লোকের সহযোগিতা ও সহানুভূতি লাভ করতে সমর্থ হবেন। উদ্বৃত্ত সামগ্রী দিয়ে নূতন নূতন কেন্দ্রকে সাহায্যও করা চলবে।

কিন্তু শিক্ষা-ব্যবস্থার আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হবার প্রধান কারণ এই যে, এই প্রণালীতে শিক্ষা-ব্যবস্থা সমাজের কেন্দ্রে স্থাপিত হবে এবং সমাজের সচ্ছলতা, স্বয়ং-সম্পূর্ণতা এবং স্বাবলম্বিতার সঙ্গে শিক্ষার ভাগ্যও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে যাবে। এতদিন পর্য্যন্ত আমরা আমাদের দৈন্যকেই আমাদের শিক্ষার অভাবের কারণ ব'লে জেনে এসেছি; কিন্তু আমাদের অশিক্ষাই যে আমাদের দৈন্যের প্রধান কারণ, সেটা ভেবে দেখিনি। শিক্ষা যদি সমাজের দৈন্য দূর করতে পারে, তবে সমাজের কেন্দ্র হিসাবে শিক্ষার দৈন্য আপনি ঘুচে যাবে।

সাত

ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনার প্রথম দ্রষ্টব্য হচ্ছে এই যে, এই শিক্ষার ভোজে সকলেরই ডাক পড়েছে। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থাতেও অবশ্য সরবে বিঘোষিত কোনও বিধি-নিষেধের প্রাচীর নেই, তবে আমন্ত্রণটা মৌখিক এবং আয়োজনটা এমনই যে অবাঞ্ছিতরা পাত পাড়ার কোন সুযোগই পায় না। নিমন্ত্রণটা শেয়ালের বাড়ি সারসের নিমন্ত্রণের মত। যথেষ্ট না হ'লেও বিদ্যালয় রয়েছে, তাতে প্রবেশেরও নিষেধ নেই, কিন্তু দেশের যারা শত-করা নব্বইজন তাদের সেই ভদ্র ভোজসভায় উপস্থিত হবার মত ভদ্র সাজ-সজ্জা অর্থ-সামর্থ্য ও অবসরের অভাব, এবং সেখানে যা পরিবেশন করা হয় তা তাদের কাছে অর্থহীন।

কথাটা আর একটু স্পষ্ট ক'রে বলা যাক। বিদ্যালয়ে যেতে হ'লে কিছু কাপড়চোপড়ের প্রয়োজন এবং সেগুলিকে খানিকটা পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখা দরকার। কিন্তু আমাদের গ্রামগুলিতে দশ-বারো বছরের ছেলের উলঙ্গতা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার, কারণ কাপড় জোটানোর সামর্থ্যের অভাব। বিদ্যালয়গুলিতে বিদ্যা হোক না হোক, নিত্য নূতন পুঁথিপত্রের প্রয়োজন। অন্নের অভাবে অনশন যেখানে স্বাভাবিক ব্যাপার, সেখানে পুঁথির কড়ি জুটবে কোথা থেকে! সুতরাং পাততাড়ি বগলে বিদ্যালয়ের পথ না ধ'রে নগ্ন অর্দ্ধনগ্ন শিশুরা অন্যের দাসত্ব বরণ করে। কিন্তু

জনসাধারণের শিক্ষা-বিমুখতার সবচেয়ে বড় কারণ শিক্ষা-প্রণালী ও শিক্ষার বিষয়বস্তু। অন্নের সমস্যাটা এখানে প্রত্যক্ষ এবং নিত্য, তাকে অবহেলা ক'রে যে ব্যবস্থা দীর্ঘকাল ধ'রে প্রতিদিন সুদীর্ঘ অবসর দাবি করে, তাকে গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়। বয়স্কদের শিক্ষাদান-প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয় এই কারণেই। সারাদিন পরিশ্রমের পর কতকগুলি অক্ষরপরিচয় এবং দৈনন্দিন সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কহীন কতকগুলি সংবাদ সংগ্রহের কোন সার্থকতা এরা দেখতে পায় না।

বিদ্যালয়গুলি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, সমাজের কর্ম্মপ্রবাহের সঙ্গে এদের কোন যোগ নেই; সেজন্য বিদ্যালয়গুলির প্রতি জনসাধারণের কোন মমতা নেই। বিদ্যালয়ে যায় ধনী ও মধ্যবিত্ত পরিবারের গুটিকতক ছেলেমেয়ে, বিদ্যালয়ের আওতায় তারা নিজেদের এক-একটি কেউ-কেটা ব'লে ভাবতে শেখে, যে বিশাল সমাজ বাইরে প'ড়ে রইল তাকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে। ফলে সমাজের নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়, বিদ্যালয় হয়ে ওঠে বাস্তব জগতে কল্পলোকের মত। দারিদ্র্য যাদের স্পর্শ করে না, তারা ওখানে বাস্তবকে এড়িয়ে পালিয়ে বেড়ায়: দরিদ্রের কাছে ওগুলি শেয়ালের কাছে আঙুর ফলের মত অপ্রাপ্য ব'লে অবজ্ঞেয়।

নয়ী তালিমী পরিকল্পনায় বিদ্যালয়কে সমাজের কেন্দ্রে স্থাপিত করা হয়েছে। এখানে সকলের জন্য সহজ স্বাভাবিক ব্যবস্থা রয়েছে, জীবনের বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে এনে সামর্থ্যের ফুলকে কৃত্রিম টবে ফোটাবার ব্যবস্থা করা হয় নি। বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিকে সমগ্র জাতির সহজ-অধিগম্য ও প্রয়োজনানুগ ক'রে সমগ্র জাতির মিলিত শক্তিতে এদের রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজকাল শিক্ষার ফলটা ভোগ করে সমাজের ওপর-তলার মুষ্টিমেয় লোকেরা, কিন্তু বোঝাটা ব'য়ে বেড়ায় নীচের-তলার সর্ব্বসাধারণ। এজন্যই বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের কোন উৎসাহ এবং সহযোগিতা নেই। নূতন পরিকল্পনায় শিক্ষার মাধ্যম হয়েছে জনসাধারণের দৈনন্দিন কাজগুলি, তাই এখানে আমরা সমগ্র সমাজের উৎসুক সহযোগিতা আশা করতে পারি।

প্রথমে সাত বৎসরের অনূর্দ্ধবয়স্ক শিশুদের কথা ধরা যাক। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা এদের সম্বন্ধে নীরব। অথচ এরাই নাকি জাতির ভবিষ্যৎ! আমাদের এই বিরাট দেশে এরা বেড়ে ওঠে পঙ্গপালের মত। এদের জন্মের দায়টা ভগবানের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বাবা নিশ্চিন্ত হন, এদের প্রতিপালন ও যত্নের ভারটা পড়ে অদৃষ্টের ওপর। ধনীর ঘরে এরা হাঁপিয়ে ওঠে আদরের আতিশয্যের মধ্যে। একটু ট'লে ট'লে হাঁটতে গেলে চাকর-চাকরানীরা ছুটে আসে বিপদের ভয়ে; একটু নিজের পায়ে দাঁড়াবার উপায় নেই—পরের কাঁধে চাপতে হয়। এরা খায় নিজের স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে নয়, এদের গ্রহণ করতে হয় পিতামাতার ঐশ্বর্য্যের স্বাদ; সাজ-সজ্জায় এদের স্বাস্থ্যের বা প্রয়োজনের দিকে কখনও দৃষ্টি দেওয়া হয় না—এদের ব'য়ে বেড়াতে হয় পারিবারিক ঐশ্বর্য্যের বিজ্ঞাপন। দরিদ্রের ঘরে এরা বেড়ে ওঠে কুৎসিত অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে, বিশীর্ণ মাতৃস্তন্যের দুগ্ধের স্বাদ এরা কখনও পায় কিনা সন্দেহ। অতিভোজনে যখন ধনীর ঘরের দুলালেরা অকর্ম্মণ্য হয়ে ওঠে, এরা তখন পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে দুর্ব্বহ জীবনের গুরু ভারকে ব'য়ে বেড়াবার জন্য প্রস্তুত হয়। একটু মুক্ত হাওয়া, একটু অম্লান আলো এদের জীর্ণ বিবরে প্রবেশ করতে পারে না। ধনীর গৃহে যখন প্রাচুর্য্যের মধ্যে অতি-সাবধানতার প্রাচীর তুলে শিশুর বিকাশকে ব্যাহত করা হয়, দরিদ্রের ঘরের শিশু তখন শূন্য ভাণ্ডার ও শীর্ণ পরিসরের মধ্যে অদৃষ্টের কোলে আশ্রয় নেয়। এই শিশুদের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে সমগ্রভাবে অল্পই ভেবে দেখিছি। শিশুর যে স্বাধীন সত্তা আছে, তার যথার্থভাবে বেড়ে ওঠার ওপরই যে সমাজের মঙ্গল নির্ভর করে, তা আমরা ভুলে গেছি। পাকে পাকে এরা কুসংস্কারের বিধি-নিষেধের নাগপাশে জড়ানো, এদের আত্মবিকাশের কোন সুযোগই আমরা রাখি না। নূতন ব্যবস্থায় বয়স্কদের শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশুদের প্রয়োজনীয়তা ও তাদের উপযুক্তভাবে গ'ড়ে তোলার আবশ্যকতা ও উপায় সম্বন্ধে সমাজকে সচেতন ক'রে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবার শিশুশিক্ষার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এদের সমাজের গলগ্রহ না ক'রে সম্পদে

পরিণত করার উপায় সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সমাজকে যা পুষ্ট ও ঐশ্বর্য্যশালী করে, তা ধন নয়, সুস্থ সমর্থ শিক্ষিতমনা মানুষ। এই শৈশব-জীবনের প্রথম পর্য্যায় প্রকাণ্ড মহীরুহের ক্ষুদ্র বীজের মত। এই বীজ দুষ্ট রোগজীর্ণ হ'লে গাছের বেড়ে ওঠার সকল সম্ভাবনা নির্ম্মূল হয়।

শিশুর জন্য প্রয়োজন পরিমিত ও পুষ্টিকর খাদ্যের, পরিচ্ছন্ন ও বিস্তৃত পরিবেশের, শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য প্রচুর স্বাধীনতার এবং সর্ব্বোপরি উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক ও তত্ত্বাবধায়িকার। পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব লাভের সুযোগ আমাদের দেশে সুলভ; এই দায়িত্ব গ্রহণের শিক্ষার কোন প্রয়োজন আমরা বোধ করি না। ফলে পিতামাতার অবজ্ঞা ও অবহেলার সুযোগে শিশু কেবলমাত্র আত্মনাশের স্বাধীনতাই লাভ করে। আমাদের দারিদ্র্যের ও সম্পদ উৎপাদনের শিক্ষার অভাবে শিশুর উপযুক্ত খাদ্যের অভাব ঘটে এবং শিশুমৃত্যু ও আজীবন রোগজীর্ণতা দ্বারা সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

শিশুদের পূর্ণবিকাশের জন্য আমাদের প্রাথমিক প্রয়োজন অর্থ নয়। হঠাৎ কতকগুলি টাকা হতে পেলেই মা-বাবারা তাঁদের সন্তান সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠবেন না বা শিশুপালনে তাঁদের দক্ষতা জন্মাবে না। যদি সমগ্র সমাজকে এ সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তোলার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় এবং সমাজের সম্পদ বৃদ্ধি ক'রে শিশুর সকল অভাব মেটাবার ব্যবস্থা আমরা করতে পারি, তবেই শিশুদের সম্বন্ধে সুব্যবস্থা আমরা করতে পারব।

সমগ্র গ্রামসমাজের সহযোগিতার মধ্য দিয়ে এই সুকঠিন এবং অতি প্রয়োজনীয় কাজটি সহজেই সুসম্পন্ন করা সম্ভব ব'লে মনে হয়। নয়ী তালিমী পরিকল্পনা এই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্যসমাজ গঠনেরই ব্যবস্থার কথা বলেছে। আগেই বলেছি যে, আমাদের দারিদ্র্যের জন্য বিশেষভাবে দায়ী আমাদের অজ্ঞতা। যদিও আমাদের চারদিকে অজস্র সম্পদ ছড়ানো রয়েছে, তবু আমরা সেগুলিকে আহরণ করতে অক্ষম। আমাদের দারিদ্র্য ও দৌর্ব্বল্যের আর একটা প্রধান কারণ

আমাদের অন্তর্কলহ। আমরা আমাদের ছেঁড়া কাঁথার সম্বলকে আঁকড়ে বসে থাকি এবং পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করি। এজন্যই আমাদের দেশে গরু যথেষ্ট থাকলেও উৎকর্ষের অভাবে দুধ জোটে কম। যাও জোটে তাও শিশুর জন্য না রেখে বাজারে বিক্রি ক'রে ফেলি। আমরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে অল্প জমিতে গরুর জন্য যথেষ্ট খাদ্য উৎপাদন করতে জানি না, অসময়ের জন্য খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারি না। আমাদের কৃষি-প্রধান দেশে গোয়ালের আবর্জ্জনা—গোময়, গোমূত্র ইত্যাদি অমূল্য সম্পদ, সেগুলিকে আমরা রক্ষা করতে এবং বিধিমত প্রয়োগ করতে অপারগ। আমাদের অন্নপ্রধান খাদ্যে শরীর গঠনের উপাদানগুলি যথেষ্ট পরিমাণে থাকে না, সুতরাং ভাবী মাতা ও শিশুর জন্য দুগ্ধ একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সমগ্র গ্রামসমাজকে একত্রিত ক'রে আমাদের প্রাথমিক সমস্যার সমাধান করা যায়—নূতন পরিকল্পনায় সেটাই দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের জনবহুল কৃষিপ্রধান বাংলা দেশে প্রতি বাড়িতে শিশুর জন্য প্রচুর উন্মুক্ত স্থান রাখা সম্ভব নয়, কিন্তু শিশুদের অবাধ বিচরণের জন্য সমগ্র গ্রামে এক খণ্ড ভূমি রাখা মোটেই অসম্ভব নয়। বিদ্যাকেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে শিশুর নিয়মানুবর্ত্তিতা ও পরিচ্ছন্নতার স্বভাব গ'ড়ে উঠবে। পরিমিত এবং নিয়মিত আহারের ব্যবস্থা হবে এখানে এবং তা সম্ভবপর হবে গ্রামের গোধনের উৎকর্ষ সাধন ক'রে। শিশু তার পরিচ্ছন্ন স্বভাব একবার গ'ড়ে উঠলে নিজেই গৃহের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করায় সাহায্য করবে। পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের জন্য চিরদিন ভাড়া-করা লোকের কোন প্রয়োজন নেই। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে সেবার কাজ (nursing) যাঁরা শিখবেন তাঁরা গ্রামেরই লোক, এই শিশুদেরই আপনজন। তাঁরা তাদের অশিক্ষা, বিকৃত পরনিন্দা-পরচর্চ্চার অভ্যাসকে সংস্কৃত ক'রে শিশুদের বিকাশের সহায়তা করবেন। এর পরিবর্ত্তে গ্রামের লোক এঁদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী জোটাবে।

দ্বিতীয়ত, সাত থেকে চোদ্দ-পনেরো বছরের কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষার

কথা। এই বয়সের পরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জীবনের দায়িত্ব গ্রহণের প্রশ্ন ওঠে। সামান্য শিক্ষা থেকেও যারা বঞ্চিত, তাদের কথা ছেড়ে দিলেও যে সামান্য সংখ্যক শিশু আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে তথাকথিত শিক্ষা লাভ করে, তারাও জীবনের জন্য প্রস্তুত হবার কিছুমাত্র সুযোগ পায় না। ফলে পারিবারিক শান্তি নষ্ট হয়, অভাবে অনটনে সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে, অজস্র সম্পদ উৎপাদনের সম্ভাবনা থেকে সমাজ বঞ্চিত হয়। একান্ত অসহায়ভাবে আমাদের কিশোর-কিশোরীরা অদৃষ্টের হাতে আত্মসমর্পণ করে। এই অসহায়তার জন্য দায়ী তাদের দুর্ব্বলতা, এবং দুর্ব্বলতার মূলে রয়েছে অশিক্ষা। পরিবেশকে প্রত্যক্ষভাবে জানার ও আয়ত্ত করার কোন ব্যবস্থা আমাদের বর্ত্তমান বিদ্যালয়গুলিতে নেই, এবং চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত সমস্যাগুলিকে বিশ্লেষণ ও জয় করার কোন শিক্ষাও সেখানে দেওয়া হয় না। তাদের সহজ কর্ম্মপটুতা ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত চাঞ্চল্যকে ব্যাহত ক'রে আমরা শিশুদের কর্ম্মশক্তিকে পঙ্গু ক'রে ফেলি। দু-একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। আমরা সবাই জানি যে, আমাদের প্রাথমিক অভাব হচ্ছে অন্নবস্ত্রের অভাব। কিশোরবয়স্কদের বিদ্যালয়ে না পাঠাতে পারার প্রধান কারণ এই যে, বিদ্যালয়ে আসার মত ভদ্র সাজ-সজ্জা মা-বাপ জোটাতে পারেন না; এদের অন্ন যোগাবার সামর্থ্য তাদের নেই; এদের অর্থকরী এবং সাংসারিক কাজে ব্যবহার করে বাপ-মায়া হাল-ভাঙা সংসারকে কোন মতে চালিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। তাই ক্ষেতে এদের কাজে লাগিয়ে, পরের বাড়ি চাকর-চাকরানীর কাজ করতে দিয়ে, বাসন-মাজা রান্নার কাজে এদের অষ্টপ্রহর খাটিয়ে ওদের অন্নসমস্যার একটা সমাধান ক'রে পিতা-মাতা নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করেন। আমাদের বর্ত্তমান বিদ্যালয়গুলিতে ব্যয়টাই ষোল আনা, আয় শূন্য; এ অবস্থায় বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ ক'রে ভবিষ্যতে সন্তান কোন দিন উপার্জ্জনক্ষম হবে—এই আশায় বাপ-মা দিন গুনতে সক্ষম হন না। এঁরা চোখ বুজে বিপদ এড়াবার চেষ্টা করেন এবং তার ফলে আশু বিপদ এড়াবার চেষ্টাটা শিশুদের সারা জীবনের জন্য পঙ্গু ক'রে তোলে। শিক্ষাহীন সামর্থ্যহীন শিশুরা নিজের স্বাধীনতা ও সমগ্র কর্ম্মশক্তি বিক্রয় ক'রে কোন মতে বেঁচে থাকার সংস্থান করতে সমর্থ হয়

মাত্র, কিন্তু তাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। নূতন পরিকল্পনার প্রতিপাদ্য হচ্ছে এই যে, কাজের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করলে যেমন এই প্রাথমিক সমস্যাগুলির সমাধান করা সম্ভব, তেমনই শিশুদের মানসিক বিকাশ এর মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ করা সম্ভব ; সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সম্পদ বাড়িয়ে জাতিকে বর্ত্তমান ক্রমাবনতি থেকে রক্ষা করা সম্ভব। প্রতি দিন ২।৩ ঘণ্টা সূতা কাটলে শিশু তার বস্ত্রের অভাব মেটাতে পারে, অথচ তার শিক্ষার এবং আত্মবিকাশের কোন বাধা জন্মে না। এমনই ভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বাগানের কাজ ও চাষের কাজ করতে শিখলে অন্নসমস্যা ঘোচানো সম্ভব, অথচ সেই সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি, পরীক্ষামূলকভাবে কাজ করার ক্ষমতা ইত্যাদি বিকশিত হয়। সুতরাং এর ফলে এক দিকে যেমন শিশুর অন্নবস্ত্রের প্রাথমিক সমস্যাটার সমাধান হয়, অন্য দিকে তেমনই এদের শিক্ষিত হয়ে ওঠবার ফলে উৎপাদনক্ষমতা বেড়ে যায় এবং সেই সঙ্গে সমাজ শ্রীসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে।

বুনিয়াদী শিক্ষার কালক্রমে অন্যূন সাত বছর হবে ব'লে স্থির করা হয়েছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রথম দুই বৎসর শিশুর উৎপাদন একেবারে সামান্য হ'লেও তৃতীয় বৎসর থেকে শিশু তার শিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলানের মত যথেষ্ট উপার্জ্জন করতে পারে। অন্য দিকে বিহারে ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষা দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে এই সময় কাজের মাধ্যমে শিক্ষার জন্য শিশুর মানসিক উন্নতি ব্যাহত হওয়া দূরে থাক্, এই সময় থেকেই তার শিক্ষার মান সাধারণ বিদ্যালয়ের মানকে ছাড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে চলতে শুরু করে। সুতরাং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে দিলে শিশু চাষী কিংবা তাঁতী হয়ে উঠবে, তার মানসিক বিকাশ কিছু হবে না, সে কোন শিক্ষা লাভ করবে না—একথা যাঁরা মনে করেন তাঁদের ধারণা ভ্রান্ত। অন্য দিকে শিশুদের শ্রমলব্ধ পণ্য বিক্রয় ক'রে মাষ্টারমশাইদের বৃত্তির সংস্থান হবে এবং এভাবে বিদ্যালয় আর্থিকভাবে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়ে উঠবে—একথা যাঁরা মনে করেন তাঁদের ধারণাটাও আমার সত্য ব'লে মনে হয় না।*

---

* এ সম্পর্কে আমার ধারণা অনেকখানি পরিবর্ত্তিত হয়েছে। আমরা এসম্পর্কে 'বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতি' নামক গ্রন্থের ২য় খণ্ডে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

প্রথমত, শিল্পশিক্ষার সাকরেদি যারা করে, তাদের পেছনে ব্যয় যত হয়, আয় ততটা হতে পারে না। তা ছাড়া স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, শিশুকে ওস্তাদ তাঁতী বা চাষী ক'রে গ'ড়ে তোলাই এই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য নয়, তার মনকে সম্প্রসারণশীল সচল বৈজ্ঞানিক ক'রে গ'ড়ে তোলাই লক্ষ্য। সুতরাং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সবটুকু ব্যয় এদের শ্রমলব্ধ পণ্য বিক্রয় ক'রে পুষিয়ে নেওয়া সম্ভবপর নয়। বস্তুত বিহারে, ওয়ার্ধায় ও বোম্বেতে সাত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে এই সত্যটাই প্রমাণিত হয়েছে। তা ছাড়া শিশুকে পণ্য-উৎপাদনের যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করার একটা প্রকাণ্ড বিপদ আছে। অধ্যাপক কে. টি. সাহার মতে সেটা হচ্ছে, শিশুর মধ্যে ওই বয়সেই একটা বণিকবৃত্তি জাগ্রত ক'রে দেবার বিপদ। তিনি আশঙ্কা করেছেন যে, শিশুর উৎপাদনের ওপরেই যদি শিক্ষকের বৃত্তি নির্ভর করে, তবে শিক্ষক তাঁর পাওনা-গণ্ডা পাওয়ার লোভে দাস-চালকে পরিণত হতে পারেন। তাঁর এই আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয় ব'লেই মনে হয়।

দ্বিতীয়ত, শিশুর উৎপাদনের সবটুকু যদি বিদ্যালয় গ্রহণ করে, তবে আমাদের সমাজের মূল সমস্যাটাই অমীমাংসিত থেকে যায়। শিশুর বিদ্যালয়-প্রবেশের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে তার দৈন্য, এই দৈন্যের জন্যই সে নিরন্ন বস্ত্রহীন, এই দৈন্যের জন্যই তাকে শিক্ষালাভের পরিবর্তে দাসত্ব বরণ করতে হয়। বিদ্যালয় যদি তার শ্রমোপার্জিত সমস্ত সম্পদ গ্রহণ করে, তবে অবস্থাটা অপরিবর্তিত থেকে যায় এবং বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণ এ ব্যবস্থাতেও দেশের শত-করা নব্বইটি শিশুর কাছে অপ্রবেশ্য থেকে যায়।

তৃতীয়ত, শিশুদের তৈরি এই পণ্য বিক্রয় করার জন্য সরকারের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করা হয়েছে। কারণ পণ্যহিসাবে এরা বাজারে নিপুণ শিল্পীর রচনার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে না। সরকারের ওপর এই নির্ভর অর্থহীন ব'লেই আমার মনে হয়। তবু জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব'লে হয়তো এ ব্যবস্থা আংশিকভাবে সফল হতে পারে।

আমার মনে হয়, আর্থিক স্বপ্রতিষ্ঠতার কথা সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখা প্রয়োজন।

প্রথমত, বর্ত্তমান পরিকল্পনায় যে সমাজ-ব্যবস্থার কথা আমরা ভাবছি, তা কেনা-বেচার সমাজ নয়। এখানে উৎপাদন হবে ব্যবহারের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নয়। নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থার মারফৎ সমাজের আবালবৃদ্ধবনিতা যা উৎপাদন করবে, তা ধন নয়—ঐশ্বর্য্য, পণ্য নয়—ব্যবহার্য্য দ্রব্য। কৈশোরে যে সময় বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ নষ্ট হয়ে যায় অন্নের অভাবে বস্ত্রের অপ্রতুলতায়, কিশোর-কিশোরীরা তখন তাদের অন্নবস্ত্র উৎপাদনের ভার নিজেরা নেবে। তারা সমস্যার সম্মুখীন হবে, ভয়ে পিছিয়ে গিয়ে আত্মহত্যা করবে না, সমস্যাকে জয় করতে শিখবে। তাদের তৈরি বস্ত্র হাটে বিক্রয় করার জন্য নয়, নিজেদের নগ্নতা ঢাকবার জন্য; তাদের তৈরি ফসল অন্যকে অভুক্ত রেখে নিজেদের গুদামজাত করার জন্য নয়, চড়া দামে বিক্রি ক'রে অর্থকে পুঞ্জীভূত করার জন্য নয়, নিজেদের জীবনধারণ এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য। এখানে কলের সঙ্গে প্রতিযোগিতার প্রশ্ন নয়—বিপথে চালিত ক'রে আমরা যে সময় ও সামর্থ্যের অপব্যবহার করি, সেই সময় ও সামর্থ্যের সদ্ব্যবহার এটা, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা ও বিকশিত করার উপায়।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষা কোন একটা পর্য্যায়ে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারে না। নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা সমগ্র সমাজের জন্য, এবং সমগ্র সমাজের রূপান্তর সাধন ক'রেই শিক্ষাব্যবস্থা স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারে। আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, উত্তর-বুনিয়াদী পর্য্যায়ের শিক্ষার্থীরা কিভাবে বুনিয়াদী, প্রাক্-বুনিয়াদী ও বয়স্কদের শিক্ষাদান কার্য্যে সাহায্য করতে পারেন। এই পর্য্যায়ে যাঁরা শিক্ষকতার জন্য শিক্ষা লাভ করবেন, তাঁরা শিক্ষাদানকার্য্যে সহায়তা ক'রে বিদ্যালয়ের ব্যয় অনেকটা কমাতে পারবেন। বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে এই পর্য্যায়ে যে সব কুটীরশিল্পের কাজ আরম্ভ হবে সেগুলি বিদ্যালয়ের আয় বৃদ্ধি করবে। বয়স্করাও বিনা ব্যয়ে শিক্ষালাভের পরিবর্ত্তে কায়িক শ্রম দ্বারা বিদ্যালয়কে সাহায্য করবেন। এভাবে সমগ্র গ্রাম-সমাজের সহযোগিতায় এবং

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দ্বারা পুষ্ট উৎপাদন-ক্ষমতা দ্বারা বিদ্যালয় আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়ে উঠবে।

তৃতীয়ত, এই শিক্ষা-ব্যবস্থা যদি প্রমাণ করতে পারে যে, এ দ্বারা জনসাধারণের সেবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে করা যায়, তবে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত সাহায্যে এর গোড়াপত্তন ও ভিত্তি দৃঢ় হতে পারে। আমাদের দেশে আজকাল অধিকাংশ বিদ্যালয় বেসরকারী এবং সেগুলি গ'ড়ে ওঠার মূলে আছে জনসাধারণের দান। যদি আমরা বর্ত্তমান ব্যবস্থার দুর্ব্বলতা ও অনুপযোগিতা ভাল ক'রে বুঝতে পারি, তবে নূতন ব্যবস্থাকে চালু করার জন্য অর্থের অভাব হবে না ব'লেই মনে হয়। দেশের বহু লোক জনসাধারণের সেবা ও উন্নতির জন্য নিঃস্বার্থভাবেই দান করেছেন এবং দান করতে প্রস্তুত আছেন। যদি প্রমাণ করা যায় যে, বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য দান ক'রে তাঁদের উদ্দেশ্য বহুলপরিমাণে ব্যর্থ হয়েছে এবং নূতন পরিকল্পনার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই ভবিষ্যৎ সমাজের উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায় রয়েছে, তবে এঁরা এগিয়ে আসবেন সন্দেহ নেই। অবশ্য জাতীয় সরকারের সাহায্য ও পৃষ্টপোষকতা থাকলে তবেই জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ করা চলে, ব্যবস্থার কার্য্যকরিতা বেড়ে ওঠে। সমাজ গঠন করতে এবং তার মধ্যে প্রাণশক্তি সঞ্চার করতে যে প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজনই প্রাথমিক প্রয়োজন এবং নূতন ব্যবস্থাই যে সেই প্রকৃত শিক্ষা জনসাধারণের কাছে নিয়ে আসতে পারে—এটা যদি আমরা বুঝতে পারি, তবে শিক্ষা-ব্যবস্থা ও সমাজের মধ্যে আজ যে কৃত্রিম গণ্ডি রয়েছে সেটা ভেঙে পড়বে, সমাজ গ'ড়ে উঠবে নূতন প্রাণশক্তি নিয়ে এবং সেই গঠনকার্য্যে নেতৃত্ব করবে শিক্ষা-ব্যবস্থা। তখন এই ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কুণ্ঠিতভাবে অন্যের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে হবে না। এইটেই আমার মনে হয় শিক্ষা-ব্যবস্থার আর্থিকভাবে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার মূল কথা।

আর একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েই আমরা প্রসঙ্গান্তরে প্রবেশ করব। অনেকেই ব'লে থাকেন যে, হস্তশিল্পের পণ্ডশ্রম না ক'রে যন্ত্রশিল্পের দ্বারস্থ হয়ে দেশকে সম্পদশালী করার ব্যবস্থা করা হয় না কেন?

রবীন্দ্রনাথের একটা লেখা থেকে খানিকটা উদ্ধৃত ক'রে এর উত্তর শুরু করা যাক।—"রাশিয়া যে কাজে লেগেছে এ হচ্ছে যুগান্তরের পথ বানানো; পুরাতন বিধি-বিশ্বাসের শিকড়গুলো তার সাবেক জমি থেকে উপড়ে দেওয়া; চিরাভ্যাসের আরামকে তিরস্কৃত করা। এ রকম ভাঙনের উৎসাহে যে আবর্ত্ত সৃষ্টি করে তার মাঝখানে পড়লে মানুষ তার মাতুনির আর অন্ত পায় না, স্পর্দ্ধা বেড়ে ওঠে; মানবপ্রকৃতিকে সাধন ক'রে বশ করবার অপেক্ষা আছে এ কথা ভুলে যায়, মনে করে তাকে তার আশ্রয় থেকে ছিঁড়ে নিয়ে একটা সীতা-হরণ-ব্যাপার ক'রে তাকে পাওয়া যেতে পারে। তারপরে লঙ্কায় আগুন লাগে তো লাগুক। উপযুক্ত সময় নিয়ে স্বভাবের সঙ্গে রফা করবার তর সয় না যাদের, তারা উৎপাতকে বিশ্বাস করে, অবশেষে লাঠিয়ে পিটিয়ে রাতারাতি যা গ'ড়ে তোলে তার উপরে ভরসা রাখা চলে না। তার উপরে ভর দীর্ঘকাল সয় না।"

আমরা রাতারাতি মন বদলানোতে বিশ্বাস করি না, তার ক্রমবিকাশে বিশ্বাস করি। মন যেখানে রাতারাতি ভোল বদলায়, নিমেষে যেখানে তার চিরাচরিত পথ ছেড়ে সোৎসাহে নূতন কাজে মাতে, সেখানে উৎসাহটা প্রায়শ মেকী হয়ে থাকে, সন্দেহ করা চলে যে পেছনে বলপ্রয়োগের একটা বিভীষিকা আছে। আমাদের সমগ্র দেশ এখনও লাঙল-চরকার স্তরে রয়েছে; ট্রাক্টর, কাপড়ের কলের বিজ্ঞানের ছায়ামাত্র তাকে স্পর্শ করে নি। আমাদের জীবনের গতি রুদ্ধ হয়ে গেছে, চিরাচরিত অভ্যাসের আরাম ছেড়ে আমরা চোখ মেলে দেখতে বা বিন্দুমাত্র এগিয়ে যেতে অনিচ্ছুক। এই অপমৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করা আবশ্যক সন্দেহ নেই, কিন্তু চোখ-কান বুজে লাফ দেওয়াটাই এগিয়ে চলার একমাত্র বা প্রকৃষ্ট উপায় নয়। আজ যদি আমরা বিংশ শতাব্দীর যন্ত্রপাতি একদিনে বিজ্ঞানহীন দেশের ঘাড়ের ওপর চাপায়ে দিই, তবে সেটা জোর ক'রে চাপানো হবে; যাদের ওপর চাপানো হবে তারা হবে অসহায় যন্ত্রমাত্র, এরা পদে পদে নির্ভরশীল হয়ে উঠবে যন্ত্রবিদ্‌দের ওপর, স্বাধীনভাবে একটু নড়া-চড়ার কোন উপায় থাকবে না তাদের। আমার ধারণা, পাশ্চাত্যের শোষণযন্ত্রের এটাই হচ্ছে

বাহুবল। সমগ্র ইউরোপ যখন অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে ছিল, তখনই সমাজের উপর-তলায় এসে পড়েছিল বিজ্ঞানের আলো। তার ফলে যন্ত্র আবিষ্কৃত হ'ল, সম্পদ বাড়ল; কিন্তু যারা দেহের রক্তবিন্দু দিয়ে যন্ত্রকে প্রাণ দিলে, তাদের দুর্দ্দশার সীমা রইল না। বিরাট যন্ত্রদানবের রহস্য তাদের কাছে রইল অজানা, যন্ত্রের প্রাণহীন অংশের মতই তাদের অদৃষ্ট যন্ত্রের চাকার সঙ্গে ঘুরতে লাগল। রাশিয়ার মত বিশ্বকর্ম্মা দেশও এই বিপদ থেকে রক্ষা পায় নি। সেখানেও আজ এক জাতের লোক জন্মেছে, যাদের বলা যেতে পারে পরিচালকের জাত। তাদের বিদ্যা অনেক, প্রকাণ্ড যন্ত্রের খুঁটিনাটিগুলি তাদের নখাগ্রে। তারা শ্রমিকদের চাইতে ৮।১০ গুণ মাইনে পেয়ে থাকে। কাজ বা পরিশ্রম তারা নিশ্চয়ই বেশি করে না; যন্ত্রগুলি রাষ্ট্রের সম্পত্তি; তবু এই তফাং কেন? কারণ সহস্র জোড়াতালি-লাগানো, স্ক্রু-বল্টু-ঠাসা, বিরাট যন্ত্রকে আয়ত্ত করতে হ'লে এদের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে সত্য, কিন্তু দাসত্বের চেহারা বদলালেও তার উচ্ছেদ হয় নি। তবে সেখানে অবস্থাটা একান্ত শোচনীয় হয়ে ওঠে নি তার কারণ এই যে, সেখানে শিক্ষার ব্যাপারটা চলছে পুরাদমে, শ্রমিকদের পরনির্ভর হয়ে থাকার প্রয়োজনীয়তাকে তারা উচ্ছেদ করতে চায়; তাতে আশা করা যায় যে, এরা হয়তো বিপদটাকে একদিন কাটিয়ে উঠবে।

আমরা মনে করি যে, যদি আমরা সমগ্র জাতিকে বিজ্ঞানের শিক্ষা দিয়ে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দিকে এগিয়ে নিতে পারি, তবে স্বাভাবিকভাবে জাতীয় উন্নতি সাধিত হবে। আমরা আজ জাতি হিসাবে মরণের মুখে এসে দাঁড়িয়েছি; কিন্তু আমাদের যা আছে, একটু শিক্ষা পেলে, আমাদের অবহেলিত সম্পদকে ব্যবহার করতে জানলে আমরা এই অপঘাতকে এড়িয়ে যেতে পারি। আজ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অনেকখানি এগিয়ে গেছে, নূতন ক'রে বহু পরিশ্রমে বহু সময় ব্যয় ক'রে সেগুলি নূতন ক'রে আবিষ্কার করার প্রয়োজন আমাদের নেই। কিন্তু এই আবিষ্কারের সবগুলি চোখ বুজে গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন আছে কি না, সেটাই বিবেচ্য; এখানে

বিবেচনা করার সময় না নিয়ে এবং অন্যকেও সময় না দিয়ে যন্ত্রসভ্যতাটা জাতির ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। যন্ত্রের জটিলতা বিজ্ঞানের দুর্বলতারই লক্ষণ, বিজ্ঞানের সাধনা হওয়া উচিত যন্ত্রকে সরলতর করার প্রচেষ্টা। বৃহত্ত্বই যন্ত্রের ঔৎকর্ষ নয়, তার ঔৎকর্ষ শক্তি। অবোধ্য যন্ত্রের সেবা দাসত্বেরই নামান্তর। লাঙলকে চাষী স্পষ্ট বোঝে, যন্ত্রের জন্য তার পরের ওপর নির্ভর করতে হয় না। চাষীকে বৈজ্ঞানিকভাবে চাষের জন্য প্রস্তুত করলে সে তার প্রয়োজনানুযায়ী যন্ত্রের উন্নতির ব্যবস্থা সহজেই করতে পারবে। এভাবে যান্ত্রিক ব্যাপারে ক্রমোন্নতিটা হবে স্বাভাবিক, জবরদস্তিমূলক নয়।

তা ছাড়া, বিজ্ঞান আজ নিজেই নিজের কৃত্রিম শক্তিকে সন্দেহের চোখে দেখছে। চাষের কাজে ট্রাক্টর, রাসায়নিক সার ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত কি না, গরুকে কৃত্রিম আহার দিয়ে বেশি দুধ উৎপন্ন করলে খাদ্য হিসাবে সত্যি কোন লাভ হয় কি না—এসব কথা বিজ্ঞানকে আবার নূতন ক'রে ভাবতে হচ্ছে। বিজ্ঞান এবং যন্ত্রসভ্যতার অধিকাংশ অবদানই হচ্ছে বিলাসদ্রব্য। জীবনকে সহজ সুন্দর করা অবশ্যই প্রয়োজনীয়, কিন্তু বিলাসের দিকে মানুষের মন কতখানি ফেরানো উচিত এবং একবার এগিয়ে চললে কোথাও দাঁড়ি-টানা সম্ভবপর কি না, সেটা ভাববার বিষয়। বিলাসের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে লোভ, এবং সেই লোভ রয়েছে আমাদের সকল দুর্ভাগ্যের মূলে, সেজন্য আমাদের সাবধান হওয়া উচিত।

সেবাগ্রাম

মধ্যপ্রদেশের উষর প্রান্তর। চারিদিকে ধু ধু করে ঢেউখেলানো মাঠ, বন্ধ্যা কৃপণ ধরিত্রী, জনবিরল দিগন্ত। কালো মাটী-পাথরে কাঁকরে ভরা জলের অভাবে শুকনা খট্ খট্ করছে। বর্ষার মাসকয় চারিদিক শ্যাম চিক্কণ হয়ে ওঠে, নির্জ্জল প্রান্তরে থরে থরে বিচিত্র ফুল ফুটে ওঠে—অন্য দিকে আসে ম্যালেরিয়া বহন করে বিপুল মশকবাহিনী ; শীতের স্পর্শ পেতে না পেতেই শ্যামলতা ঘুচে যায়, মৃত্যু-পাণ্ডুর হয়ে ওঠে চারিদিক, তারপরই শুধু কঠিন কর্কশ পাথরের রাশি আর কালো ধূলা।

এরি মধ্যে বাস করে শিবাজী মহারাজের বংশধররা! নেহাৎই এরা শান্ত শিষ্ট। রাজা মহারাজার সঙ্গে যুদ্ধ করা দূরের কথা, প্রকৃতির কড়া হাতের মার খেয়েই ভয়ে জড়সড়। গ্রামগুলি যেন মৌচাকের মত, নেহাৎই যেন ভয়ত্রস্ত পশুর মত লোকগুলি ঘর বেঁধেছে কেবল একত্র থাকার পশু-প্রবৃত্তির বশে। একটুখানি ফাঁক, এতটুকু আঙ্গিনা নেই কোথাও। বাড়ীর ওপর বাড়ী—ওদের বাড়ী বলাও কঠিন, অন্ধকার খাঁচা। ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ লোকগুলি, সামাজিক দলাদলিতে আরও দুর্ব্বল, আরো অসহায়। গ্রামগুলি দুই ভাগে ভাগ করা, গ্রামে গ্রামে দুইটি মন্দির—বড় ভাগটা, ভাল ভাগটা সবর্ণদের, অন্য ভাগে ঘেসাঘেঁসি, ঠেসাঠেসি করে পড়ে রয়েছে হরিজনের দল। হরিজনদের মধ্যেও ভাগাভাগি দলাদলির অন্ত নেই—গোণ্ড, মাহার, মারাঠি আরো কত কি দল উপদল। রোগ আর দারিদ্র্য মৌরসী পাট্টা নিয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন অজ্ঞতার অন্ধকারে কোথাও একটু ফাঁক নেই। রোগ আর দারিদ্র্যকে সবাই স্বীকার করে নিয়েছে ভগবানের মার বলে। অসহায় ভাবে সবাই গা এলিয়ে দিয়েছে। উদয়াস্ত পশুর মত খাটে সবাই, কৃপণ ধরণীর সঙ্গে তবু পেরে ওঠে না, কাজ জোটে মেলা, কিন্তু পেট ভরে না ; এই যুদ্ধের বাজারেও দিন মজুরের মজুরী কার্য্যবিশেষে সাড়ে চার আনা থেকে আট আনার ওপরে ওঠেনি। নিজের চারদিককে নিজেরাই

নরককুণ্ড করে তোলে। ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের যা কিছু থাকে অবশিষ্ট জুয়া খেলে সেটা ওড়ায়।

সবরমতীর আশ্রম ছেড়ে এমনি লোক আর পরিবেশের মধ্যে একদিন এলেন গান্ধীজি। ভারতের ঘুণে সভ্যতা, নিষ্ঠুর নগ্ন দারিদ্র্য, ভীরু অন্ধ অসহায়তা, মুমূর্ষু গ্রাম জীবনের সঙ্গে মুখোমুখী দাঁড়ালেন তিনি। বল্লেন—একে জয় করতে হবে। তিনি নীড় বাঁধলেন। সেবাগ্রাম আশ্রমের ভিত্তি পত্তন হল!

গান্ধীজী ডাকলেন সবাইকে—কে নেবে এই কঠিন কাজের ভার—সেবাগ্রামকে বাঁচিয়ে তোলার। তিনি ভাবলেন যে যদি একটি ক্ষেত্রেও প্রমাণ করা যায় যে আমরা আবার বাঁচতে পারি, পরিবেশকে জয় করে নিজের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে পারি, জাতিগত ক্ষুদ্র সংকীর্ণতা দলাদলির উর্দ্ধে উঠে সবল হতে পারি তবে সমগ্র মুমূর্ষু জাতিকে বাঁচাবার পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। তাই তিনি বল্লেন, যদি সেবাগ্রামকে সঞ্জীবিত করে তুলতে পারি তবে সমগ্র ভারতবর্ষকে সঞ্জীবিত করে তুলতে পারবো।

অর্দ্ধযুগেরও বেশী সময় কেটে গেল। গান্ধী আশ্রমকে কেন্দ্র করে বিরাটকায় নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। নিখিল ভারত চরখা সঙ্ঘ, গোসেবা সঙ্ঘ দিনে দিনে চন্দ্রকলার মত বাড়তে লাগল। নূতন গ্রামের পত্তন হল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নবাগত কর্ম্মীদের নিয়ে। যেখানে দুটি পরিবারের জন্য শবজী জোটা কঠিন ছিল* সেখানে বহু শত লোকের উপযুক্ত শাক শবজী উৎপন্ন হতে লাগল, প্রকৃতির হাতের শক্ত মুঠোটা অনেকটা নরম হয়ে এল। ৪।৫টা গরু থেকে বিরাট গোশালা গড়ে উঠল। এতদিন যে অনাদৃত গরুগুলি বোঝার মত ছিল একটু যত্নের ফলে তারা সম্পদ হয়ে উঠল—শক্ত মাটীতে হাল চালাবার মত শক্তি অর্জ্জন করল তারা। দুধের পরিমাণ

* হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত আর্য্যনায়কমের মুখে শুনেছি যে, তাঁরা যখন প্রথম সেখানে গিয়ে বাস করা সুরু করেন তখন দুইটি পরিবারের জন্যও শাকশবজী গ্রাম থেকে জোগাড় করা কঠিন ব্যাপার ছিল এবং প্রায়শঃ তা পাওয়াই যেত না।

বেড়ে গেল বহু গুণে। গ্রামের লোকদের জুটল বহুবিধ চাকুরী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আর তাদের কর্ম্মকর্ত্তাদের কাছে।

কিন্তু আধা সহর আধা গ্রাম সেবাগ্রামে যখন এই পরিবর্ত্তন ঘটছিল তখন প্রকৃত গ্রামে কি হচ্ছিল ?

গ্রামে যারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী নিলে তাদের অবস্থা একটু ফিরল বটে, অনেকেরই দুটো ভাত কাপড়ের জোগাড় হল, কিন্তু গ্রামের দারিদ্র্য রয়ে গেল তেমনি অসহনীয়। বিশেষ করে যারা সেবাগ্রামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী নিলে গ্রামের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ হয়ে এল ক্ষীণ! ভোরে উঠে তারা বেরিয়ে পড়ে, গাঁয়ের বাড়ীটা হয়ে ওঠে হোটেলখানার মত। আশ্রম ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অংশটা ঝক্‌ঝকে তকতকে, কিন্তু গ্রামের রাস্তাঘাট দুর্গন্ধ, নোংরা, ময়লাভরা। পথভরা মানুষের মলমূত্র, বাড়ীঘর তেমনি ময়লা নোংরা। এমন কি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী নিয়ে যারা প্রতিষ্ঠানের মারফৎ সাফাই সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিল তাদেরও গাঁয়ের বাড়ীতে নোংরামি ঘুচল না। গ্রামের পথঘাট ঝাঁট দিবার জন্য প্রায় দুই সহস্র টাকা খরচ হয়ে গেল কিন্তু অকথ্য নোংরামি একটু কমল না ; কেবল গাঁয়ের লোক ভাবতে লাগল পথঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কোন দায়িত্ব নেই। গ্রামে আদি-কালের একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল কিন্তু গান্ধী যখন সেবাগ্রামে এলেন তখন সারাটি গ্রামে মাত্র দুটি লোক লেখাপড়া জানতো। কিন্তু এর পর দীর্ঘ দিনের চেষ্টায় বিশেষ কোন উন্নতি হলো না—দুটি থেকে শিক্ষিতের সংখ্যা পঞ্চাশকে ছাড়িয়ে গেল না। হরিজন সবর্ণের মধ্যে বিরোধের প্রাচীর তেমনি অভেদ্য রইল। গ্রামের সংস্কৃতি রইল তেমনি নীচু স্তরে ; জুয়াখেলার স্রোত রইল তেমনি প্রবল, লজ্জাহীনতা ঘুচল না। ৭।৮ বৎসরে খুব কম করে গ্রামের উন্নতির জন্যই ১২।১৩ সহস্র টাকা খরচ হলো কিন্তু গ্রামের চেহারার উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন প্রায় কিছুই হল না—দারিদ্র্য রইল তেমনি তীব্র, অপরিচ্ছন্নতা রইল তেমনি অসহনীয়, অজ্ঞতা রইল তেমনি সর্ব্বব্যাপী। সব চেয়ে বড় ব্যর্থতা ছিল এই খানে যে, চরখামন্ত্রের উদ্গাতার ঘরের এত কাছে মিলের কাপড়ের স্রোতে

মন্দা পড়ল না। তুলার উৎপাদনের কমতি সেখানে ছিল না, কিন্তু তুলা উৎপাদিত হোত বিক্রির জন্য। গ্রামে চরখা সঙ্ঘের উৎপাদন কেন্দ্র ছিল, তাতে কাপড় তৈরী হত মাত্র, আবার বিক্রীর জন্য তৈরী মাল চরখা সঙ্ঘে চলে যেত। কাপড়ের উৎপাদন ও ব্যবহারের সঙ্গে গ্রামের নাড়ীর কোন যোগ ছিল না; তুলার প্রাচুর্য্য, উৎপাদনের সুবিধা সব কিছুর মধ্যেও গ্রামের বস্ত্রাভাব তীব্রই রইল।

বাইরের সমস্ত সাহায্য দিয়ে গ্রামের উন্নতি করার চেষ্টা ব্যর্থ হল। ১৯৪২ এর আগষ্টের পর যে বিপর্যায় ঘটল স্বাভাবিক সকল কাজ তাতে হয়ে গেল বিপর্য্যস্ত। ১৯৪৪ এ গান্ধীজি বেরিয়ে এলেন কারাপ্রাচীরের অন্তরাল থেকে। সেবা গ্রামের চরম দুর্দ্দশা তাঁকে তীব্র আঘাত করল। কেউ যদি সেবা গ্রামের পরীক্ষায় এই ব্যর্থতার লজ্জা থেকে তাঁকে উদ্ধার করতে প্রস্তুত না হয় তবে তিনি অনশন করবেন বলে স্থির করলেন।

গান্ধীজির শরীর তখন অত্যন্ত অসুস্থ, অনশনের কৃচ্ছ্রতা সহ্য করার শক্তি তাঁর নেই মোটেই, কিন্তু কুলিশ কঠোর মন তাঁর তৈরী হয়ে গেছে। সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কিন্তু এ কঠিন ভার নেবে কে?

এমন সময়ে ভিক্ষুণী সুপ্রিয়ার মত যিনি এগিয়ে এলেন তাঁর নাম শান্তা নারুলকর। মহারাষ্ট্রের মেয়ে তিনি। স্নিগ্ধতা এবং কঠোরতার এক অপূর্ব্ব সম্মেলন তাঁর মধ্যে দেখেছি। আজ তিনি সম্পূর্ণ গাঁয়েরই মেয়ে হয়ে গেছেন; গ্রামের সঙ্গে, গ্রাম জীবনের সঙ্গে তাঁর একটা সত্যকারের যোগ স্থাপিত হয়েছে। মাত্র কয়েক বৎসর আগে তিনি সমগ্র ইউরোপ ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, যাঁর চালচলনের মধ্যে সাহেবী ঠাট ছিল আজ তাঁকে দেখে তা বোঝার কোন উপায়ই নেই। আজমীর কলেজের অধ্যক্ষতার কাজ ছেড়ে তখন তিনি হিন্দুস্থানী-তালিমী সংঘের বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার নিয়েছেন। তালিমী সংঘে তখন লোকের একান্ত অভাব। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আর্য্যনায়কমজী ও আশাদেবী সমস্ত অসুবিধার কথা জেনেও শান্তাদেবীকে গাঁয়ের কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য সাগ্রহে সম্মতি দিলেন। গান্ধীজি স্বয়ং নিলেন পথপ্রদর্শন ও উপদেশদানের ভার।

আশ্রম জীবনের অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্যটুকুকেও ত্যাগ করে শান্তাদেবী গাঁয়ের প্রান্তে এসে ঘর বাঁধলেন ১৯৪৫ এর মার্চ্চ মাসে। নূতন পরীক্ষা সুরু হল।

গান্ধীজির প্রথম নির্দ্দেশ হলো দুইটি। একটি কর্ম্মী সম্বন্ধে, অন্যটী গ্রাম সম্বন্ধে। তিনি বলেন যে গ্রাম-সেবককে গ্রামে গিয়ে থাকতে হবে গ্রামেরই একজন হয়ে, গ্রামেরই সুখ দুঃখের সঙ্গে আপনাকে একান্তভাবে জড়িয়ে। কিন্তু তবু গ্রামজীবনের সঙ্গে সমপর্য্যায়ে নিজকে নামিয়ে আনলে চলবে না। তাঁকে একটা সুন্দরতর, মহত্তর জীবনের আদর্শ ধরতে হবে গ্রামের সামনে; কিন্তু সে আদর্শ এমন হওয়া চাই যাতে তা গ্রামবাসীর আয়ত্বের সম্পূর্ণ বাইরে না হয়। শান্তাদেবীকে তিনি নির্দ্দেশ দিলেন নঈ-তালিমের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিক্ষিকা রূপে গ্রামে গিয়ে বাস করতে। নবজাত শিশু থেকে মুমূর্ষু পর্য্যন্ত সকলের সকল সমস্যাকে শিক্ষার দৃষ্টি নিয়ে দেখতে হবে। তাঁকে প্রমাণ করতে হবে যে প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা গ্রামের ও জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান করা সম্ভব, আমাদের মুমূর্ষু গ্রাম জীবনের ভীষণ পরিবেশকে আয়ত্ত করে জীবনের মানকে উন্নত করা সম্ভব—ভাল করে বেঁচে থাকা প্রত্যেকের আয়ত্তাধীন।

তাঁর দ্বিতীয় উপদেশ হ'ল বাইরের কোন অর্থ-সাহায্য না নিয়ে গ্রামের সম্পদ এবং গ্রামবাসীর শক্তিকে বিকশিত করতে হবে। বস্তুতঃ শান্তা দেবীর কৃতকার্য্যতা প্রথম পরীক্ষা বলে নির্দ্ধারিত হল সেবাগ্রামের জন্য বাইরের কোন অর্থসাহায্য না নেওয়া।

এই দুইটি নির্দ্দেশকে সম্বল করে এবং আরোগ্য ব্যবস্থা এবং উৎপাদন ও বণ্টন এই তিনটি কাজকে কেন্দ্র করে শান্তা দেবী তাঁর দুরূহ কাজ সুরু করেন।

গ্রামের কাজ করায় তিনি নিম্নলিখিত নীতিগুলিকে অনুসরণ করছেন :—

(১) তিনি মনে করেন যে গ্রামের লোকের মধ্যে অভাব বোধ যতক্ষণ না জাগ্রত করা যায় ততক্ষণ শুধু উপদেশ আর ভিক্ষা দিয়ে তাদের উন্নত করা সম্ভব নয়। মানুষের মধ্যে যখন অভাববোধ তীব্র হয়ে ওঠে তখন তার সমাধান সে নিজের শক্তিতেই করতে পারে। বাইরের সাহায্য নিতে তাই তিনি একান্ত নারাজ।

উদাহরণস্বরূপ সেবা গ্রামের অপরিচ্ছন্নতার কথা ধরা যেতে পারে। ঝাড়ুদারের জন্য অজস্র টাকা খরচ করেও সেবাগ্রামের পথঘাট পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব হয়নি। শুধু ছোটদের নয়, পাইখানা করে পথঘাট নোংরা এবং চলার অযোগ্য করে তোলা বড়দেরও অভ্যাস ছিল। মেয়েদের পর্য্যন্ত এ বিষয়ে লজ্জা সরমের বালাই ছিল না, প্রকাশ্য দিবালোকে পথের ধারেই তারা পায়খানা করতে বসে যেত। আজকাল গ্রামের বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা সপ্তাহে ২।৩ দিন গ্রাম পর্য্যটনে বেরোয়। পথঘাট তারা যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে। এই পরিষ্কার করার কাজে তারা তাদের নিজেদের মা-বাপকেও টেনে আনে, বয়স্কদের শিক্ষক হয়ে পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে তাদের ঔদাসীন্য দূর করতে বিশেষ সাহায্য করে থাকে। প্রতি রবিবারে গ্রামের লোকেরা সামুদায়িক সাফাই করে। সকল লোক এতে যোগ দেয় তা নয়, খুব কমই আসে ; কিন্তু নিজের পরিশ্রমে করা সাফাই যাতে গ্রামের অন্য লোকেরা নষ্ট না করে ফেলে সেদিকে তারা দৃষ্টি দেয়। মেয়েরা আজকাল গ্রামের প্রান্তে তৈরী করে দেওয়া পাইখানা ব্যবহার করতে শিখছে, অন্ততঃ প্রকাশ্য স্থানে পাইখানা করা লজ্জাকর এই সচেতনাটুকু এদের হচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই সচেতনতা আরো স্পষ্ট। রাস্তা ঘাট অভ্যাস বশে নষ্ট করলেও তারা এতে দস্তুরমত লজ্জা পায়। এমনি করেই গ্রামের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা জ্ঞান বাড়ছে, গ্রাম পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠছে।

রোগ এবং তার প্রতিষেধের ব্যাপারেও এই একই নীতি তিনি পালন করছেন। গ্রামে একটি ছোট চিকিৎসালয় আছে। এই চিকিৎসালয়টির ভার নিয়েছেন বাসন্তীবেন (Miss Barbara Hartland)। গ্রামের বিদ্যালয়ে শিশুদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। শিশু অসুস্থ হলে তার পিতামাতাকে খবর দেওয়া হয়। শিশুর অসুস্থতার কারণ তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। এর মাঝখান দিয়ে পরিবারের সঙ্গে স্থাপিত হয় নিবিড় যোগ, পরিবারের ইতিহাস জানা যায় ভাল করে। এ ভাবে পিতামাতাকে শিশুর এবং তাদের নিজেদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন করে দেওয়া হয়। আমাদের পল্লীগ্রামে বেশীর ভাগ রোগ অর্দ্ধাহার ও অনাহার জনিত।

সুতরাং স্বাস্থ্যের আলোচনার সঙ্গে কৃষির আলোচনা এবং খাদ্যবিজ্ঞানের আলোচনা আপনি এসে পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের অজ্ঞতার জন্যই আবার নানারকম অভাব ঘটে থাকে। খাদ্য ব্যাপারে সামান্য মাত্র হেরফের করে এবং শাকসব্জী উৎপাদন ব্যাপারে কিছুটা সাহায্য করে গ্রামের রোগ কমানোতে অনেকখানি সফলতা পাওয়া গেছে। এখানেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে চিকিৎসা ব্যাপারটা যাতে গ্রামবাসীর আয়ত্তের বাইরে না চলে যায়। গ্রামে একটা প্রসূতি-সদন খোলার কথা চলছিল। এই জন্য অর্থ-টা আমদানী হবার কথা ছিল বাহির থেকে। শান্তা দেবী এটা বন্ধ করে দেন—গ্রামের ঋণ বাড়াতে তিনি রাজী নন। তাঁর মতে গ্রামের নারীরা যেদিন মাতৃত্বের দায়িত্ব এবং তাদের কর্তব্য বুঝবেন সেই দিনই মাত্র এমন প্রসূতি সদনের প্রয়োজন হবে এবং সেদিন গ্রামবাসীরা নিজেরাই তাদের এই পরম প্রয়োজনীয় জিনিষটি তৈরী করতে সক্ষম হবে। ইতিমধ্যে বাসন্তীবেন গ্রামের দাইদের নিয়েই ভাবী মাদের সেবা করছেন এবং গ্রামের স্ত্রীপুরুষকে সচেতন করে তুলছেন।

তাঁর এই নীতির মধ্য দিয়ে তিনি এই কথাটাই বিশেষ ভাবে প্রমাণ করতে চাইছেন যে অর্থ ই সম্পদ নয়। আমাদের গ্রামগুলি প্রকৃত পক্ষে দরিদ্র নয়, প্রকৃতির অজস্র সম্পদের অভাব নেই সেখানে, লোকবলেরও কমতি নেই কোথাও! অভাব যার—তা হচ্ছে জ্ঞানের, অভাব বোধের অভাবের। গ্রামের শক্তিকে যদি ঠিক মত কাজে লাগান যায় তবে গ্রামকে অসহায় ভাবে পরনির্ভর হয়ে থাকতে হবে না কখনও, অন্যের দ্বারা শোষিত হবার সুযোগও গ্রামবাসী তখন স্বেচ্ছায় করে দেবে না।

গ্রামের কাজ করার ব্যাপারে তাঁর দ্বিতীয় নীতিটি হচ্ছে নিজের মনগড়া পরিকল্পনা জোর করে গ্রামের ঘাড়ে চাপিয়ে না দেওয়া। প্রায়শঃ দেখা যায় যে কর্মী যখন গ্রামে যান তখন তিনি গ্রামকে নিজের মনের মত উন্নত করার একটা স্বপ্ন নিয়ে যান। গ্রামের বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টি তাঁর প্রায়ই থাকে না। তিনি সাধারণতঃ নিজকে গ্রামের সবাইর চেয়ে উচ্চস্তরের মনে করেন এবং সেজন্য দেওয়া নেওয়ার কোন নিবিড় যোগ স্থাপিত হয় না। এজন্য বহু বৎসর গ্রামে কাজ করার পর বহু কর্মীকে বলতে

শোনা যায়—লোকগুলি কি নেমকহারাম ওদের জন্য এত করলুম, কিন্তু ওরা আমার কথা কানে নিতে চায় না। এর পেছনে থাকে অন্যকে আয়ত্তাধীন করে রাখার একটা প্রচ্ছন্ন মনোবৃত্তি।

সেবাগ্রামে আজ কাজ হচ্ছে গ্রাম সংস্থার মারফৎ। তারা যেখানে নিজেরা আসেন উপদেশ নিতে সেখানেই শান্তাদেবী গ্রামেরই একজন হিসাবে মত প্রকাশ করে থাকেন, যদি শান্তি দেবীর পরিকল্পনা কোথাও সম্পূর্ণ কার্য্যকরী হয়ে ওঠে তবে তা এই জন্যই হয় যে গ্রামবাসীরা সেটাকে মঙ্গলজনক বলে গ্রহণ করেন। যতক্ষণ না কোন কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতনতা গ্রামবাসীর কাছে স্বাভাবিক ভাবে আসে ততক্ষণ কোন পরিকল্পনা, যত ভাল ও উঁচু দরের হোক না কেন, তারা তা গ্রহণ করতে পারে না এবং করাও উচিত নয়। একথা অবশ্যই সত্য যে, যিনি উন্নয়নের জন্য কর্ম্মী হয়ে যাবেন, তাঁর জ্ঞান ও শক্তি গ্রামের লোকের চাইতে অনেকক্ষেত্রেই বেশী হবে এবং তিনি একটা আদর্শ ও পরিকল্পনা নিয়ে গ্রামে যাবেন, নইলে তিনি কাজ করতে পারবেন না। কিন্তু তিনি গ্রামের মধ্যে যতক্ষণ কোন সমস্যা সম্বন্ধে সচেতনতা ও তার সমাধানের উপযুক্ততা আনতে না পারবেন ততক্ষণ কেবল বক্তৃতা দিয়ে সেই পরিকল্পনাকে গ্রহণোপযোগী করতে পারবেন না।

বহুদিন উপদেশ অনুশাসনে যে হরিজন সমস্যা ঘুচেনি আজ তা আপনা আপনি ভেঙ্গে পড়েছে; হরিজন সবর্ণ নির্ব্বিশেষে সব শিশুই আজ বিদ্যালয়ে একত্র দুধ কলা খেয়ে প্রাতরাশ করে, খাবার জলের কুয়া সবাই মিলে সাফ করে, সবাই জল তোলে, পঞ্চায়েৎ সভায় হরিজন সবর্ন এক সাথেই বসে। আজ জিনিষটা স্বাভাবিক হয়ে আসছে।

গ্রামে আজ যতগুলি প্রতিষ্ঠান আছে তারা ধীরে ধীরে সম্পূর্ন স্বায়ত্ত শাসনাধীন হয়ে উঠছে; নিজেদের নিয়মকানুন তারা নিজেরাই তৈরী করে থাকেন এবং পরিদর্শন করে থাকেন নিজেরাই। তার ফলে কাজ ঢিমে হয় নি কোথাও বরং দক্ষতা অনেকাংশেই বেড়ে গেছে। এর মধ্য দিয়ে গ্রামবাসীদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে,

পরস্পরের সহযোগিতায় কাজ করার শক্তি বেড়েছে। আজ নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা রচনা গ্রামবাসীরা নিজেরাই করছেন, নালা, নর্দ্দমা পথ ঘাট নিজেরাই ঠিকঠাক করছেন।

(৩) গ্রামের কাজ সম্বন্ধে তৃতীয় নীতিটি হচ্ছে গ্রামের উৎপাদন বণ্টন সম্বন্ধে। গান্ধীজির মতে গ্রামের উৎপাদন হবে ব্যবহারের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নয়। উৎপাদন কেন্দ্রগুলি এবং জমি হবে গ্রামবাসীদের যৌথ সম্পত্তি। এই দিকে কাজ সবে মাত্র স্বরু হয়েছে। যৌথ উৎপাদন এবং প্রথানুসারে বণ্টনের পরিকল্পনা ধীরে ধীরে তৈরী হচ্ছে। স্থতরাং এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে এরি মধ্যে গ্রামের লোকেরা সমবায় নীতিতে শস্যভাণ্ডার ষ্টোর ইত্যাদি খুলেছে। লভ্যাংশটা কারো পকেটে যায় না গ্রামের সার্ব্বজনিক কাজে ব্যয়িত হয়। খাদির জন্য স্থতা আজ বাহির থেকে আসা বন্ধ হচ্চে, গ্রামে যাতে স্থতা তৈরী হয় এবং তৈরী খাদি যাতে গ্রামের লোকেরই ব্যবহারে লাগে সেই ব্যবস্থা করার দিকে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। গ্রামের লোকেরাই তুলা উৎপাদন থেকে খাদি তৈরী করা পর্য্যন্ত সব কিছু করবে এবং ব্যবহারও করবে তারাই।

সেবাগ্রামের বাহিরের চেহারার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন এই কম সময়ে হয়েছে তা বলা যায় না। তা আশা করাও উচিত নয়। ধীরে ধীরে যে পরিবর্ত্তন সেখানে সংসাধিত হচ্ছে, তা না জানলে সেবাগ্রামের কাজ সম্বন্ধে কোন ধারণা করা সম্ভবপর নয়। গান্ধীজির এই নূতন পরীক্ষা কতখানি সফল হল তার বিচার হবে ভবিষ্যতে, কিন্তু ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন কি করে গোড়া থেকে হচ্ছে তার একটা চিত্র দেবার চেষ্টা করলাম। বহু অর্থ ব্যয় করে যে পরিচ্ছন্নতা সেবাগ্রামে আনা যায় নি আজ গ্রামবাসীরা নিজেরাই সে পরিচ্ছন্নতার স্থষ্টি করছেন—অর্থ দিয়ে নয়, শ্রম দিয়ে। গ্রামের চৌদ্দ বৎসরের নিম্নবয়স্ক অর্দ্ধেকেরও বেশী শিশুরা আজ শিক্ষালাভ করছে। গ্রামবাসীরা নিজেদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও নিজেরা রচনা করছেন, ভীরু অসহায়তা কমছে। হরিজন সবর্ণ একসঙ্গেই কাজ করছেন। অন্নবস্ত্রের জন্য অসহায় পরনির্ভরতা

কমেছে, সঙ্গে সঙ্গে শোষিত হবার সম্ভাবনাও কমেছে, সংহত স্বাধীন সবল গ্রাম-সমাজের ভিত্তি গড়ে উঠছে।

যে স্বল্প সময় ও স্বল্প পরিসরের মধ্যে সেবাগ্রামের বিরাট পরীক্ষার পরিচয় দেবার চেষ্টা করলাম, তাতে কোন বিষয় বস্তুর প্রতি সুবিচার করা সম্ভব নয়, তবু এই চেষ্টা করার কারণ দুইটি। প্রথমতঃ আজকাল নানাকারণে অনেকেই সেবাগ্রামে গিয়ে থাকেন। সেখানে প্রকাণ্ড প্রতিষ্ঠানগুলির এলাহি কারবার দেখেই তাঁরা সাধারণতঃ ফিরে আসেন; আবর্জ্জনাপূর্ণ নেহাৎই সাধারণ সেবাগ্রামের দিকে তাঁদের নজরও পড়ে না, অথবা নজর পড়লেও তাঁরা দেখবার মত কিছু সেখানে পান না; বরং গান্ধীজীর আশ্রমের এত কাছে এরকম কুৎসিত গণ্ডগ্রাম দেখে তাঁরা নিরাশ হয়ে ফিরে আসেন। কি বিরাটপরীক্ষা সেখানে চলছে তাঁর একটা আভাস হয়ত এই প্রবন্ধে পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়তঃ ভারতের সর্ব্বত্রই গ্রামের সমস্যা মূলতঃ এক। গ্রামের সেবা সম্বন্ধে গান্ধীজির কি নির্দ্দেশ তার একটা আভাস এ প্রবন্ধে দেবার চেষ্টা করেছি। গ্রামসমাজ বা গ্রাম সভ্যতায় যাঁরা বিশ্বাস করেন না, তাঁদের হয়ত এতে কিছুই লাভ হবে না। কিন্তু গঠনমূলক কর্ম্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যারা মুমূর্ষু গ্রামে জীবন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন তাঁরা হয়ত লাভবান হবেন।